সমাজ ও বিবাহ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাঙালি হিন্দু সমাজের ইংরেজি শিক্ষিত উপরের স্তর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এ চাঞ্চলের কারণ বাইরের আঘাত, সুতরাং ও অংশের সজীবতার প্রমাণ।

ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন আমলে সে বিদেশি শাসন তার অধীন দেশের লোককে যতটা সুযোগ দিয়েছিল তার ষোলো আনা সুবিধা নিয়েছিল বাঙালি হিন্দু। রাজার দেশের ভাষা শিখে, এবং মোগল শাসন ও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মিশিয়ে কর আদায় ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় যে প্রকাণ্ড ও জটিল শাসন যন্ত্র ইংরেজ এ-দেশে আমদানি করেছে তার মোটা কলকজ্জাগুলো চালাবার বিদ্যা আয়ত্ত করে তার প্রতিষ্ঠা ও চলার কাজে সে কম সাহায্য করেনি। এই মিস্ত্রিগিরির মজুরি সে যা পেয়েছে তাই হচ্ছে উচ্চশ্রেণি বাঙালি হিন্দুর এ দেশে প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বের বাস্তব ভিত্তি। বাঙালি হিন্দু যে নতুন ভাষা ও বিদ্যায় সহজেই নিজেকে রপ্ত করে তুলেছিল তার এক কারণ তার মনে অতীত গৌরবের এমন কোনও স্মৃতি ছিল না। যার অভিমান এর বাধা জন্মাতে পারে।

ব্রিটেনের রাজতত্তঙ্গ দখল সে সানন্দেই বরণ করেছিল। যার ফলে পাটনা থেকে পেশোয়ার, কটক থেকে মধ্যভারত ইংরেজের বিজয় নিশানের পিছু পিছু সে ছুটেছিল হাতে কলম, বগলে ইংরেজি বিদ্যা শিখবার পুথি। বিজিত দেশে নব শাসন রীতি চলতি করতে, আর সে বিদ্যায় সে দেশের লোকের হাতে খড়ি দিতে। কেরানিগিরি গুরুগিরির

এই একচেটি ব্যবসায় উত্তরা পথ জুড়ে বাঙালি হিন্দু বহুদিন কায়েম ছিল। আজও সেখানকার বড় বড় শহরে তার ধবংসাবশেষ আমাদের আপশোস ও আস্ফালনের খোরাক জোগাচ্ছে। স্বভাবতই এ মনপালি' ছিল সাময়িক; আর তা না হলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হতে হত। যে মাস্টার আশা করে ছেলেরা স্কুলের বিদ্যা শেষ করে নিজেরা কখনও মাস্টার হবে না, নিরাশ তাকে হতেই হয়।

কিন্তু এইটুকুই পুরো সত্য নয়। রাজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে নব ইউরোপের যে সব ভাব ও বিদ্যা ইংরেজ এ-দেশে এনেছিল, সাংসারিক সুবিধার উপায় স্বরূপে ছাড়াও বাঙালি হিন্দুর তা মনে হয়েছিল। পরম উপাদেয়। কারণ যাই হোক হিন্দু বাঙালির মনে এমন কিছু ছিল যা এদের অনুকুল।

সেই জন্য রামমোহন রায়ের মতো আশ্চর্য মানুষের বাংলায় আবির্ভাব হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মতো প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিত এ নব বিদ্যা ও ভাব প্রচারের অগ্রণী হয়ে ছিলেন। এবং প্রথম প্লাবন কেটে গেলে দেখা গেল যে বাঙালির মন এ বন্যায় ডুবে মরেনি, উর্বর হয়েছে।

ফলে ইংরেজ যুগের বাংলা সাহিত্য যা আধুনিক ইউরোপের প্রধান সাহিত্যগুলির তুলনায় নানাদিকে ছোট, কিন্তু কেবল সেই তুলনাতেই ছোট। কারণ ভারতবর্ষ কি এশিয়ার আর কোথাও এর তুল্য মূল্য আধুনিক সাহিত্য আজ নেই। এ সাহিত্যের একটি প্রধান বাণী নব ইউরোপের মুক্তির-বাণী মনে, সমাজে, রাষ্ট্রে। বাংলায় এই মুক্তির বাণী প্রত্যক্ষে ও

পরোক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্মকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালি হিন্দু ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যে বার্তা প্রচার করেছে, বৃহৎ রাষ্ট্রীয় চেষ্টার দুরূহ। পথে সাহস, নিষ্ঠা ও ত্যাগের যে আদর্শ দেখিয়েছে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মে তা ভারতবর্ষের নবজন্ম। ব্রিটিশ শাসনের কলের মজুরি কেমন করে করতে হয় বাঙালি হিন্দু অর্ধেক ভারতবর্ষকে তা শিখিয়ে ছিল, ভারতবাসীকে মানুষের মতো বাঁচতে ও মরতে হলে ও কলের যে বদল দরকার এ জ্ঞানও বাঙালি হিন্দু ভারতবর্ষকে দীক্ষা দিয়েছে। প্রথম গুরুগিরির পুরস্কার সে ইংরেজের হাতে পেয়েছে। দ্বিতীয় গুরুগিরির দণ্ড ও হাতে না পেলে প্রমাণ হত যে গুরুগিরি নিষ্ফল হয়েছে।

২

নিষ্ফল কিন্তু হয়নি। ভারতবাসীর বর্তমান রাষ্ট্রীয় চেতনা ভারতবর্ষে সর্বময়ত্বের অবসান সূচনা করেছে। ওর পরিপুষ্টিতে তার ধ্বংস। এ চৈতন্যের প্রধান উৎস যে বাঙালি হিন্দু তাতে অবাঙালি ভারতবাসীর মনে যে মোহই থাকুক ইংরেজের মনে কোনও সংশয় নেই। এই উৎসের মুখ বন্ধ করতে সাম্রাজ্যভোগী ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের যে চেষ্টা হবে তা স্বাভাবিক।

এ শতাব্দীর প্রথমে সে চেষ্টা হয়েছিল বাঙালির রাষ্ট্রীয় জীবনকে দুভাগ করে। ফল হল উলটো। রুদ্ধ স্রোত বাধাকে ঠেলে ফেলে ভারতবর্ষময় ছাড়িয়ে পড়ল। যার গতিবেগে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও চেষ্টা আজকের খাদে প্রবাহিত হচ্ছে। এইবার চলেছে।

দ্বিতীয় চেষ্টা। পূর্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীর অবস্থা ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা আজ এমন হয়েছে যে ভারতবর্ষের শাসন ও শোষণের পূর্ব রীতির বদল হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে

প্রয়োজন। আশা আছে। ওর ভিতরটা বহাল রেখে চেহারাটা বদলে দিলেই এখনকার মতো কাজ চলবে। ব্রিটিশ শাসকেরা যখন এ দেশের রাষ্ট্র ব্যবহার 'রিফর্মের কথা বলেন তখন সম্ভব তাদের মনে থাকে ধাতুর্থ–ফর্ম' অর্থাৎ আকারের পরিবর্তন। আর যদি বাধ্য হয়ে

করতে হয় তবে বাকি ভারতবর্ষের মন থেকে বাঙালি হিন্দুর রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব দূর হলে আপোষ নিষ্পত্তিতে বর্তমান সুবিধার অনেকটাই বজায় থাকবে বলে ইংরেজের বিশ্বাস। বাঙালি হিন্দুর 'একস্ট্রিমিজম বাদ দিলে বাকি ভারতবর্ষের সুইট ও রিজিনেবল' হবার আশা আছে। সেইজন্য রিফর্মের শেষ কিস্তিতে বাঙালি হিন্দুকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে বাঙালি মুসলমানের ভোটের চাপে। বাংলাদেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। তার ফলেই বাংলার রাষ্ট্র পরিষদে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যায় আসবে বেশি, এবং তাতে বাঙালি হিন্দুর রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও অন্য প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হবে 'রিফর্ম কর্তারা' এই ভরসাতেই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। বাঙালি হিন্দু যে ডেমোক্রেসির বচন আওড়ায় তার পাটিগণিতের মারে তাকে কাবু করে মজা দেখার লোভেও নয়। তাদের মনে এ আশঙ্কা ছিল যে প্রতিনিধি নির্বাচনে হিন্দু মুসলমান মিশিয়ে দিলে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানির চেয়ে রাষ্ট্র ব্যাপারে বাঙালি হিন্দু মুসলমানের কাছে

বাংলাদেশ বড় হয়ে উঠতে পারে। আর 'ওয়াইলি' হিন্দুকে বিশ্বাস কী! সেই জন্য গড়তে হয়েছে ধর্ম সাম্প্রদায়িক নির্বাচন মণ্ডলী। যাতে মুসলমান যে পরিষদে আসবে সে বুঝবে মুসলমান বলেই সে এসেছে। সে মুসলমানের প্রতিনিধি দেশের নয়। আর যাঁরা তাকে পাঠাবে তাঁরাও জানবে রাষ্ট্র ব্যাপারে তাঁরা বাঙালি নয় তাঁরা মুসলমান; প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে এক নয়, যদিও তাদের ভাষা এক এবং রক্তও এক আর দুঃখ সুখের ভোগও এক। এইখানেই শেষ নয়। নষ্ট্রের গোঁড়া গোটা বাঙালি হিন্দু সমাজ নয়, উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু। সুতরাং প্রয়োজন হয়েছে উচ্চ হিন্দু ও অনুচ্চ হিন্দুর মধ্যে প্রাচীর তোলা যাতে উচ্চবর্ণ বাঙালি হিন্দু বাংলাদেশে এক ঘরে হয়। মহাত্মার উপবাস দৈব সুযোগ; ইংরেজের আর পাঁচটা সৌভাগ্যের মধ্যে একটা সৌভাগ্য।

৩

ব্রিটিশ যুগের প্রথম আমলে পশ্চিমের নুতন ভাব ও বিদ্যার দিকে বাঙালি হিন্দুর মতো বাঙালি মুসলমান বুকে পড়েনি। কতকটা রা্জ্যাপহারী ইংরেজের উপর আক্রোশে, কতকটা সংস্কারান্ধ মৌলভি মৌলানার বিরোধিতায়। ফলে আধুনিকতার যে নদীতে বাঙালি হিন্দু স্নান করেছে, বাঙালি মুসলমান তখন তার জলে নামেনি। প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারকে বাঙালি হিন্দু যেমন যুক্তির বিচারে যাচাই করতে সাহস করেছে, বাঙালি মুসলমান তা পারেনি। মুসলমান রামমোহন কি মুসলমান বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে সম্ভব হয় নাই। এই আধুনিকতার বিরোধী, ইংরেজি শিক্ষা পরাঘুখ সম্প্রদায়ে আর্থিক সুতরাং সামাজিক বিপ্লব ঘটল। যখন ইংরেজের আপিস আদালতে ফারসির বদলে প্রচলন হল

ইংরেজি ভাষার। মুনশি মৌলভির হাতের কাজ চলে গেল। ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুর হাতে। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটা বড় মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠল। যাদের যে শিক্ষা আনলো হাতে অর্থ, সেই শিক্ষায় করল। মনকে সজীব। মুসলমান হয়ে পড়ল দরিদ্র এবং মনে অচল। আধুনিক কালে যখন বাঙালি মুসলমানের চেতনা হল, এবং নব শিক্ষায় তাঁরা শিক্ষা পেতে লাগল। তখন রাজ দরবার ও রাজ সরকারের দেশি লোকের জায়গায় হিন্দুর দখলে এবং ইংরেজি বিদ্যায় উপার্জনের আর যে সব পথ খুলেছে সেখানে হিন্দুর ঠাসাঠাসি ভিড়। নব ব্রতী মুসলমানের ওস্তাদ হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাথা গলান কঠিন।

বাঙালি মুসলমান সমাজের এই অবস্থায় রিফর্মের শেষ চালের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। নব শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা বাঙালি হিন্দুর তুলনায় এখনও অতি অল্প। যদি হিন্দুর সঙ্গে বিনা প্রতিযোগিতায় কেবল মুসলমানের খাতিরে, শিক্ষিতের সংখ্যার অনুপাতে নয় মুসলমান সমাজের নিরক্ষরত্বের পরিমাণে শিক্ষাসাপেক্ষ সরকারি চাকরি ও সরকার অনুগৃহীত অর্থাগমের অন্যান্য উপায় মুসলমানের হাতে আসে। তবে এই অল্প সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের দারিদ্র্য কমে, শিক্ষিত মুসলমানের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনোপায়ের পথ হয়, দেশে বাঙালি মুসলমানের প্রতিপত্তি ও সম্মান বাড়ে। শুধু যোগ্যতার জোরে যে মুসলমান দোতলা উঠতে পারে না। সাম্প্রদায়িক লিফটে সে অনায়াসে তেতলা উঠে যায়। এ লোভ কম লোভ নয়। সুতরাং বাংলার রাষ্ট্রসভায় যে ইংরেজরা রয়েছেন প্রাপ্যের বহু সংখ্যায় রিফর্মের ‘পলিসি’ ইমপ্লিমেন্ট করতে তাদের আওতায় মুসলমান সভ্যদের যেই কিঞ্চিৎ আধিপত্য হয়েছে

অমনি চড়াসুর উঠেছে মুসলমানের বিশেষ স্বার্থের। স্থানে এবং অস্থানে মুসলমান ধর্মে ধার্মিকের সংখ্যার অনুপাতে ভাগ বাটোয়ারায় দাবি চলেছে, যা কখনও করুণ কখনও কমিক। এর যুক্তি এক সময় বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার দৈন্য যাকে অমুসলমানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফেলা অন্যায়, অন্য সময় বাঙালি মুসলমানের পৌরুষ যা রাজার জাতিতেই কেবল দেখা যায়। কখনও মুসলমানের ব্রিটিশ রাজভক্তির কাহিনি, কখনও আরবদের বিশ্বজয়ের ইতিহাস। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভাগকে আঁকড়ে থাকতে হবে প্রাণপণে, এবং সবখানে চাই তার প্রসারমন্ত্রীগিরি থেকে পেয়াদাগিরি পর্যন্ত। এবং এই ভাগাভাগির মূল মালিক ইংরেজকে রাখতে হবে হাতে, কখনও চোখ রাঙিয়ে কখনও চোখ নামিয়ে; এবং সবচেয়ে বড় কথা তার স্বার্থে ঘা না দিয়ে। তার খোদার মেহেরবানিতে এমন দিনও আসতে পারে, যখন বাংলাদেশের চাকরি-বাকরি মুসলমানের হবে একচেট, যেমন এককালে বাঙালি হিন্দুর ছিল। মোট কথা বাঙালি মুসলমান চাকরি চাই–চাকরি আরও চাকরি।

৪

উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু যে ক্ষোভ ও আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কী! যে ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাঙালি হিন্দুর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক এই চাকরি তাদের প্রাণস্য প্রাণঃ। সরকারি চাকরি, আধা-সরকারি চাকরি, সরকারকে যাঁরা চালায় এবং সরকার যাদের জন্য চলে, সেই ইংরেজ সওদাগরের চাকরি। এ শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে এই চাকরিতে, চাকরিতেই তা বেঁচে আছে, এই চাকরির লোপে তার বিলোপের ভয়। যার এ

চাকরি যখন অন্ন তখন বাঙালি হিন্দুর মন ও আনন্দ যে আধুনিক কালচারের ফুল ফুটিয়েছে তার রসও আসছে সেখান থেকেই। সে 'কালচারের ভালমন্দ যাই থাকুক ভারতবর্ষে তা অদ্বিতীয়। এ সব চাকরির উদ্দেশ্য টাকা উপার্জন হলেও তার কতকগুলি বিদ্যা ও বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে সার্থক করায় সুযোগ, সুতরাং আত্মতৃপ্তির মূল, এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির হেতু। এই চাকরির যা এখন বাঙালি হিন্দুর হাতে আছে তার অধিকাংশ অন্যের হাতে যাবার সম্ভাবনার উদ্বেগ ও আশঙ্কা স্বাভাবিক। এবং এমন লোকের হাতে যদি যায় তুলনায় যাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতা কম তাতে ক্ষোভের কারণও আছে যথেষ্ট।

সুতরাং এর প্রতিকারের ডাকে ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু বাঙালির বড় রকম সাড়া পাওয়া যাবে। সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি বন্ধ করতে হবে। সব অনিষ্টের মূল কারণ সাম্প্রদায়িক নির্বাচন তুলতে হবে। সেজন্য বাঙালি হিন্দুর একজোট হওয়া চাই। জাতীয় কংগ্রেস থেকে সরে দাড়াতে হবে, 'হিন্দু মহাসভা'র নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। ভারতবর্ষের জন্য হিন্দুদের সঙ্গে মিলে সংঘ গড়তে হবে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার জন্য। হিন্দুকে হিন্দু না রাখলে কে রাখবে? মোট কথা ভারতবর্ষ ও বাংলার মুসলমান যেমন হয়েছে কমুন্যাল হিন্দুস্থানের এবং বাঙালি হিন্দুকে হতে হবে তেমনি কমুন্যাল, কথায় না হোক মনে এবং কাজে। মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন যে দেশের হিতের জন্যই মোসলেম লিগের কর্তাদেরও সেই বুলি। বাঙালি হিন্দুর এই নবলব্ধ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি যে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্য এইসব বক্তৃতায় প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হয়, এবং বক্তার নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি ওঠে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর সব

সময় উহ্য থেকে যায় বাংলাদেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান সংখ্যায় বেশি। বাঙালি হিন্দু যদি বাঙালি মুসলমানের কমুন্যালিজমের আঘাতে ও অনুকরণে তাদের মতোই কমুন্যাল হয় তবে মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি না কমে অবশ্য বেড়ে যাবে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ঘাত প্রতিঘাতে দু' পক্ষের সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি হবে। দলাদলি করে দলাদলি কমে না, বেড়েই যায়। এমন অবস্থায় যদি কমুন্যাল ইলেক্টোরেটের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ডেমোক্রেটিক নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা হয় তাতে কীসের ভরসা যে মুসলমান নির্বাচিত হবে এখনকার চেয়ে কম সংখ্যায়, বা যাঁরা হবে তাদের কমুন্যাল মনোবৃত্তি হবে বর্তমানের চেয়ে কম। এবং তা না হলে সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি ও বিশেষ স্বার্থের দাবি কেন দূর হবে, আর হিন্দুর হিত বা দেশের হিত সিদ্ধ হবে কেমন করে! দেশের মন যদি থাকে কম্যুনাল পুরো ডেমোক্রেটিক নির্বাচনের ফলে ঘোর কম্যুনাল রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি কিছু অসম্ভব নয়। যাঁরা আশা করেন মিশ্র নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় মুসলমানকে কুড়ুতে হবে হিন্দুর

পড়বে, যাঁরা মধ্যপন্থী তারাই হবে নির্বাচিত তাদের নিরাশ হতে দেরি হবে না। রাগ দ্বেষ যখন প্রবল থাকে তখন ও রকম ভোট ভাগাভাগি বেশি হয় না। তখন হিন্দুয়ানির ডাকে হিন্দু দেবে হিন্দুকে ভোট, মোসলেমের ডাকে মুসলমান দেবে মুসলমানকে ভোট। যাঁরা উৎকট মুসলমান ও উৎকট হিন্দু তারাই যেতে পারবে প্রতিনিধি হয়ে, আপোষ্যপন্থী কাফের ও অনার্য হবে একঘরে। খাঁটি হিন্দু ও খাঁটি মুসলমানের এই মিশ্র নির্বাচনের

এমন পরিণতি হতে পারে যে বাঙালি হিন্দুকে ছুটতে হবে ইংরেজের দরবারে ডেমোক্রেটিক কুত্তা বলিয়ে নেবার আর্জি পেশ করতে।

৫

বাঙালি হিন্দু মুসলমানের ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক দল গড়ার স্পষ্টার্থ দু' পক্ষের পাল্লা দিয়ে ইংরেজের আনুগত্য করা। আমরা হিন্দু কারও অহিত করতে চাই না, শুধু চাই নিজেদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করতে; আমরা মুসলমান কারও অনিষ্ট চিন্তা করি না, কেবল নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবির পূরণ চাই এ বুলিতে সত্য উলটে যায় না। সে সত্য হচ্ছে ধর্মমতের তফাত রাষ্ট্রীয় কাজে অবাস্তর। যেখানে পরাধীন দেশে সেই ভেদকে করতে হয়। স্বতন্ত্র অধিকারের ন্যায় অন্যায়ের বাটখারা সেখানে এই বিরুদ্ধ স্বার্থের 'ব্যালান্স' রক্ষার ভার যাবেই যাবে তৃতীয় পক্ষের হাতে। সে তৃতীয় পক্ষ নিরাসক্ত মধ্যস্থ নয়। নিজের দিকে পাল্লা ভারী করতে এমনকী মাপ সমান রাখতে তাকে খুশি করতে হবে। তার দাম আছে। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু যদি সে দাম দিতে রাজি থাকে চেষ্টা করে দেখতে পারে। সে দাম হচ্ছে ভারতবর্ষের বর্তমান জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে দাড়াতে হবে। কথায় না হোক কাজে হতে হবে তার পরিপন্থী। এ দেশে ইংরেজের যে শক্তি ও সুবিধা আছে তাকে বহাল রাখতে, এবং বর্তমানে তার যেটুকু লাঘব হয়েছে তার পূরণে ইংরেজের পুরো সহায় হতে হবে।

বাঙালি হিন্দুর বুদ্ধির উপরে ইংবেজের কিঞ্চিৎ আস্থা আছে। দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ বিজয়ে তার এই সাহায্য ইংরেজ স্বীকার করলেও করতে পারে। এবং তার বিনিময়ে ছোট বড় চাকরি ও আনুষঙ্গিক প্রভাব প্রতিপত্তির আর্জি হয়তো মঞ্জুর হবে। বাঙালি হিন্দুর স্বতন্ত্র স্বা্র্থে রক্ষায় হিন্দুর একজোট হওয়ার যে ডাক সে এই পথে চলার ডাক। কিছু কাজ আরম্ভ হলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রের স্বপ্ন বাঙালি হিন্দু দেখেছে ও ভারতবাসীদিগকে দেখিয়েছে। সে আদর্শের অনুকরণে মৃত্যুপণ তার নিকট অতীতের ইতিহাস। সে আদর্শ ও ইতিহাসকে অস্বীকার করে খণ্ড খণ্ড স্বার্থের রক্ষায় বিদেশির চির প্রভুত্বই কি সে বরণ করবে? গোয়ালন্দের পদ্মা কি হরিদ্বারের ঘাটে ফিরে যাবে, মহাতীর্থের পুণ্যলোভে? আমাদের যৌবনে স্বদেশীয় যুগে আমরা একটি গান গেয়েছি, যার ভাবার্থ মার দিয়ে দেশকে ভুলাবে আমরা দেশের তেমন ছেলে নই। হাতের মারে আমরা দেশকে ভুলি নাই, ভাতের মারের ভয়ে ভুলি কিনা তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

বাঙালি হিন্দু পাশ না ফেল?

৬

তবে এ সাম্প্রদায়িক মহামারী থেকে দেশকে বাঁচাবার কি উপায় নেই? আছে না আছে স্থির করতে এ রোগের নিদান জানা চাই। রোগ জানলেই যে তার ঔষধ আছে এমন নয়, কিন্তু রোগ নির্ণয় না হলে চিকিৎসার চেষ্টাই চলে না হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া।

বর্তমান সাম্প্রদায়িক বোগের ব্যাসিলাই উৎপত্তির প্রধান বীজাণুক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের চাকরির দ্বন্দ্ব, চাকরি এক প্রতিপত্তি, চাকরির ফলে প্রতিপত্তি, প্রতিপত্তির ফলে চাকরি দেশের অশিক্ষিত ও আচাকুরে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ, যাদের নামে এবং ভরসায় এই দ্বন্দ্ব চলে তাঁরা করে এতে লাঠিয়ালি বিনা ভাতায় নিজের খেয়ে। এই লাঠালাঠিতে তাদের নিজের হিত কিছুমাত্র নেই, অহিত আছে। ষোলো আনা, দেশের সকল উন্নতির পথ বন্ধ হয় বা বিপথে চলে। ধর্মের নামে অন্ধ উত্তেজনায় এই অজ্ঞানদের নিজের ভাল মন্দ বোধ লোপ হয়, আর সে উত্তেজনার সৃষ্টি করে শিক্ষিত মুসলমান ও শিক্ষিত হিন্দু নিজেদের শ্রেণির সাংসারিক স্বর্থ ও সাংসারিক ক্ষমতা হাসিল করার অভিসন্ধিতে। কমুনাল রোগের এই নিদান। অন্য সব কারণ এই মূল থেকেই পুষ্টি পেয়ে রোগকে জটিল করে তোলে। সুতরাং এ রোগের চিকিৎসা দেশের জনসাধারণকে মুসলমান চাষি ও হিন্দু চাষিকে, মুসলমান কারিকর ও হিন্দু কারিকরকে, মুসলমান মজুর ও হিন্দু মজুরকে পলিটিকাল দল গড়তে শেখান পলিটিকাল আদর্শ ও উপায়ের ভিত্তিতে। কলমা পড়া ও গায়ত্রী জাপার ভেদ ও সাম্য দলে টানার ফন্দি ও ফাকিতে তাদের সচেতন করা। দেশের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ যেদিন নিজের স্বার্থ মোটামুটিও বুঝবে, যেদিন পলিটিকসে দীন-এর তত্ত্ব ছেড়ে দুনিয়ার তথ্যে চোখ যাবে শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের চাকরি প্রতিপত্তির ঝগড়ার সেই দিন হবে সমাপ্তি। কারণ যে খুঁটির জোরে লড়াই সে আর খুঁটিগিরি করতে রাজি হবে না। কলমা গায়ত্রীর চাকরি ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব দেশ তখন বরদাস্ত করবে না। চাকরে হিন্দু মুসলমানের কমুন্যাল বিষ ছড়ান বন্ধ হবে না, যতদিন না। অ-চাকরে জনসাধারণের নিজেদের পলিটিকস সে বিষের থলি উগরে ফেলে। শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান অন্যান্যের যুদ্ধ সজ্জার ভয়ে বা যুদ্ধান্তে নিজেরাই চাকরি

প্রতিপত্তির একটি রফা নিষ্পত্তি করে দেশের বড় কাজে হাত দেবে। সে আশা দুরাশা। চাকরির কামনা চাকরিতে শান্ত হয় না; যত পাওয়া যায় লোভ ততই বাড়ে। হবিষা কৃষ্ণবর্ম্মেব ভুয় এবাভি বর্দ্ধতে।' কমুন্যাল রোগের চিকিৎসা দেশের চাকরিপন্থীদের হাত থেকে দেশের পলিটিকসকে ছিনিয়ে নেওয়া।

এ কাজ কঠিন। এ পথ চড়াই উতরাই-এর বিষম পথ; যার মোড়ে মোড়ে বিপদ। এ পথে প্রকাশ্য ও গোপন মুসলমান ও হিন্দু শত্রুর অবধি থাকবে না। স্বর্থনাশের যাদের আশঙ্কা। যাদের মধ্যে কাজ এবং যাদের জন্য কাজ তারাই সন্দেহ করবে ও মারমুখ হবে। তাদের উত্তেজিত করার লোকের অভাব হবে না। কমুনিস্ট বলে পুলিশ লেলিয়ে দেবার কমুন্যালিস্ট জুটবে অনেক। এ কাজের উপায় মানুষের বুদ্ধিকে জাগান, অন্ধ সংস্কারকে উসকান নয়। সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষ সে মানুষের দলের অধিকাংশ যখন নিরক্ষর অজ্ঞান। এ কাজের যাঁরা কমী তাদের চেতন ও অবচেতন মনকে করতে হবে সকল রকম সাম্প্রদায়িক রাগ দ্বেষের কলুষমুক্ত। এবং আচার ব্যবহারে যাঁরা ভিন্ন তাদের সঙ্গে শক্রিতায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে তীব্র মাদকতা তাতে মাতাল হওয়ার আনন্দ এতে নেই। বহু শ্রমে ফল ফলবে অল্প, বহু ডাকে সাড়া দেবে অল্প লোক। আশা ভঙ্গ হবে পদে পদে। তবু এই পথই পথ, আর সব অন্ধগলি।

এ পথেও সিদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তা নয়। জাতির এমন দুর্দিন আসে, যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র লোভ অন্ধ বিদ্বেষকে দূর করে তার শুভবুদ্ধি কিছুতেই জাগে না। ভারতবর্ষ ও বাংলার যদি এমন দুর্ভাগাই হয়, যদি জাতীয়তার কোনও মন্ত্রেই সাম্প্রদায়িক বিষ ধ্বংস না হয়

তবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার পালটায়, তার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হয়তো অনিবার্য হবে। কিন্তু তাতে উৎসাহের কিছু নেই; সে আমাদের পরাজয়। এমন প্রাণী আছে পারিপার্শ্বিক যখন তাদের স্বাভাবিক জীবনলীলার প্রতিকূল হয় উচুস্তরের প্রাণীর উপযোগী শরীরের যন্ত্রপাতি লোপ হয়ে তাঁরা ধাপে ধাপে নেমে যায় আদিম ভ্রাণের পিণ্ডাকার অবস্থায় শুভ দিনের অপেক্ষায়। তবুও বেঁচে থাকে। সে বাঁচা জীবস্মৃত্যু, হিন্দু স্মৃতিকারেরা যাকে বলেছেন জীবন্ত শব। জীবিত এব। শব্বাস্তে তস্মাৎপাি‌রশবা স্মৃতাঃ। জাতির পারিশবত্ব প্রাপ্তি জয়ধ্বনির কারণ নয়।

কমুন্যাল সমস্যা মীমাংসার অন্য উপায় যে কল্পনা করা যায় না তা নয়। ভারতবর্ষের বাইশ কোটি হিন্দু আট কোটি মুসলমানকে দমিয়ে ইংরেজকে তাড়ালে, অথবা আট কোটি মুসলমান বাইশ কোটি হিন্দুকে দাবিয়ে ইংরেজকে খেদালে এ সমস্যার অবশ্য মীমাংসা হয়। হিন্দু মহাসভার ভীষ্ম দ্রোণেরা ও মোসলেম লিগের সিংহ ব্যাঘ্ররা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে যে শক্তিতে সম্ভব চাকরির ভাগাভাগির উৎসাহে তার সৃষ্টি হয় না। ভাতেব চুল্লির আগুনে ড্রেড নট চলে না।

৭

উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুর চাকরি ও প্রতিষ্ঠার উপর মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অভিযানের একটা সুফল ফলেছে। উচ্চ হিন্দু যে বাঙালি হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্র অংশ সে চেতনার শুরু হয়েছে। ভাব ও চিন্তার প্রচার অল্প লোকে করা যায়, তার সৃষ্টি করে আরও অল্প লোক,

চাকরি ও প্রতিপত্তি প্রার্থী লোক অনেক হলে বিপদ কিন্তু সংখ্যার চাপ যেখানে প্রয়োজন সেখানে দল বড় না হলে কাজ হয় না। বাঙালি হিন্দুর এই সংখ্যা আছে উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে নয়, নিচু জাতি হিন্দু পল্লির ভিতরে। সুতরাং উচ্চবর্ণের হিন্দু মুখে এনেছে যে উঁচু নিচু সব হিন্দু আমরা পরস্পরের ভাই। আমরা ভিন্ন নই, আমরা এক।

এই নিম্ন শ্রেণি হিন্দুর প্রাণশক্তি যে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, অর্থহীন ও আত্মঘাতী আচারের নাগপাশে যে তাদের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম, জীবনকে পঙ্গু করে। মৃত্যুকে ঘনিয়ে আনার যত রকম ফন্দি দিনের পর দিন যে তাঁরা আবিষ্কার করে চলেছে সে দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। এরা যে কত দুর্বল, নিজের শক্তিতে কত আস্থাহীন, যেখানে এরা সংখ্যায় অল্প এবং যেখানে এরা সংখ্যায় বেশি প্রতিবেশী দুর্দান্ত মুসলমানের অত্যাচার যে এরা বিনা প্রতিকারে সহ্য করে, স্ত্রী কন্যার সম্মান রক্ষায় হাত তুলতে ভরসা করে না সে বার্তাও আমাদের বিচলিত করতে আরম্ভ করেছে। এ সব ব্যাপার নতুন নয়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পর থেকে এদের আরম্ভ হয়নি। দু-চারটি সন্ন্যাসী গোছের প্রতিষ্ঠান ছাড়া উচ্চ হিন্দুর ব্যাপক দৃষ্টি এতদিন এদিকে যায়নি। আজ যাচ্ছে নিষ্কাম প্রীতিতে নয়, নিজের গরজে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। কোন আঘাতে চৈতন্য এল সেটা মুখ্য নয়, আশার কথা যে ঘুম ভাঙছে।

এর প্রতিকারের যে উপায় উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্যবস্থা করছে তার নাম ‘হিন্দু-সংগঠন’।

হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর, উচ্চ শ্রেণির সঙ্গে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুর নড়ির যোগ এমন দৃঢ় করতে হবে যে এক অঙ্গের আঘাতে সমস্ত শরীর ব্যথা পাবে এবং প্রতিবিধানে তৎপর হবে।

অসহায় নিম্ন শ্রেণির হিন্দুকে ভরসা দিতে হবে, কথায় ও কাজে, যে তাঁরা অসহায় নয়, উচ্চ শ্রেণির শিক্ষিত হিন্দু, যাদের অর্থ আছে, বুদ্ধি আছে, বল আছে, তাঁরা তাদের ভাই, আপদ বিপদে সহায়, সুখ দুঃখের ভাগী। এবং আশা করা অন্যায় হবে না যে এতে নিম্ন শ্রেণির হিন্দু ও উচ্চবর্ণের হিন্দুর আপদ বিপদ নিজেদের আপদ বিপদ মনে করবে, সব কাজে তাদের অনুবতী হবে, সংখ্যার প্রয়োজনে নিজেদের সংখ্যা দিয়ে বাঙালি হিন্দুর অখণ্ড সংখ্যা বাড়াতে দ্বিধা করবে না।

যে সংগঠন' বাঙালি হিন্দুকে বড় ছোট অভেদে এক গোষ্ঠী করে গডতে চায় তার প্রেরণা যে অবস্থার ফেরেই এসে থাকুক না কেন জাতির পক্ষে তা পরম মঙ্গলের। কিন্তু প্রথম উৎসাহের উত্তেজনার ফেনা প্রশমন হলেই দেখা যাবে যে এ সংগঠনের যে সব পেটেন্ট মাল মশলার বিজ্ঞাপনে দেশের মনের দেয়াল ভর্তি, গড়নের কাজ তা দিয়ে বেশি দূর এগোয় না। কারণ তাতে আর যাই থাকুক চুন সুবকি নেই। ইট সাজান যায়। কিন্তু তাদের জোড়া লাগান যায় না।

যে আশ্চর্য ভ্রাতৃত্বে ভাইয়ের স্পর্শ অশুচি, তার হাতের অন্ন অমেধ্য, তার সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ পাতিত্য আনে সেই আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব নিয়ে কোনও রকম ব্যাবহারিক একত্ব বন্ধন সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যতা বর্জন, মন্দিরের দ্বার মোচন, হাতের জল চল এ সব উপসর্গের

চিকিৎসা, রোগকে রহাল রেখে। রোগ থাকতে উপসর্গ দমন করা যাবে কিনা সন্দেহ। আর যদি যায়। তবে সে রোগ যে অন্য উপসর্গের আকারে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে তা নিঃসন্দেহ। হিন্দু সমাজের সেই মূল রোগ হচ্ছে জাতি ভেদের গণ্ডি। ওর অভেদ্য খোলার আবরণ সমস্ত সমাজে এক নাড়ির যোগ স্থাপন অসম্ভব করেছে। হিন্দু সংগঠন যদি প্রকৃতই সে কাজ করতে চায়। তবে ওই গণ্ডি তুলতে হবে, ওই খোলা ভাঙতে হবে। জাতির খোপ খোপ যেমন আছে তেমনি থাকবে, শুধু ভাই বলে ডাক শুনে সমস্ত হিন্দুর হবে এক মন, এক প্রাণ–এ আশা নিজেকে বঞ্চনা করা, পরকে ফাকি দেওয়া। সামাজিক অসম্বন্ধের গভীর পরিখার যে ভেদ সুস্পষ্ট নামের জোরে সে ভেদ অভেদ প্রমাণ হবে না, কলিতে নামের মাহাত্ম্য যতই প্রবল হোক। আর এ সব বর্জন মোচন আন্দোলনের মধ্যে যে মনুমেন্ট স্পশী দম্ভ রয়েছে। কেবল শুনে শুনে গা সওয়া হয়েছে বলেই আমরা তাতে লজ্জা পাইনে। আমাদের স্পর্শ পেলে নিম্ন হিন্দু কৃতার্থ হবে এ রামচন্দ্রত্বের অভিনয় উচ্চবর্ণের হিন্দু করে কোন লজ্জায়! আমাদের দেব মন্দিরে ঢোকার অধিকারে চণ্ডাল হবে। ধন্য দেবতার এ অপমান তাঁরা করে কোন সাহসে যাঁরা গর্ব করে বলে হিন্দুর 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

৮

এ প্রস্তাবে তর্ক উঠবে জানি ইতিহাস, বিজ্ঞান, শাস্ত্রের তর্ক। এমন কাে‌নেও প্রস্তাব আছে পণ্ডিত লোকে যাকে গ্রাহ্য অগ্রাহ্য দুই প্রমাণ করতে না পারে।

অতি বুদ্ধিমান লোক বলে হিন্দু সমাজে উচু জাত যে তার নিচু জাতের হাতে ভাত খায় না, তাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ যে নিষেধ, তার মধ্যে ঘৃণা অবজ্ঞার লেশ নেই। ওটা শুধু আচার, যেমন অনেক বিধবা মা ছেলের হাতের ছোয়া খান না। তফাত কেবল এই শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের মনোভাব ছেলের উপর মায়ের স্নেহ নয়, অন্তত শূদ্র তার কোনও প্রমাণ পায় না। অন্য সমস্ত গুণ দোষ নিরপেক্ষ কেবল জন্মের ফলে একদল লোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যদলের হীনত্ব জাতি ভেদের ভিত্তি। মনু বলেছেন বটে যে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রোক্ত গুণ নেই সে হচ্ছে তেমনি ব্রাহ্মণ যেমন কাঠের হাতি ও হাতি। কিন্তু সেই পুতুল ব্রাহ্মণেরও শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করলে জাত যায়, সে শূদ্রের যতই ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকুক না কেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও অন্যের হীনত্বের ধারণা এক বস্তুর দুই পিঠ। একটি ছেড়ে অন্যটি থাকে না। জাত অল্প নিচু হলে তার উপর অবজ্ঞা, আর বেশি নিচু হলে তার উপর ঘৃণা এর অবশ্যম্ভাবী ফল। অবশ্য এই অবজ্ঞা ও ঘৃণা যখন দু'পক্ষের একান্ত অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন যে ঘৃণা করে তার সে মনোভাবে কোনও তীক্ষতা থাকে না, যে ঘৃণা পায় তারও অপমানের বোধ থাকে না। ব্যাপারটা দু' পক্ষের রোদ বাতাসের মতো স্বাভাবিক মনে হয়। দাসত্বের ইতিহাসে বার বার তা প্রমাণ হয়েছে। এটা ঘৃণার অভাব নয়, ঘৃণার চরম ও ভয়ংকর পরিণতি। যাক এ মনস্তত্ত্বের তর্কে লাভ নেই। যাদের বাঁচিয়ে আচার' তাঁরা একে অপমান বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে। শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা তাদের মধ্যে যত বাড়বে এ অপমানের বোধ তত বেশি হবে, এবং জাতের দেয়াল আঁকড়ে থাকলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ হবে অনতিক্রমণীয়। এর লক্ষণ চার দিকে দেখা যাচ্ছে 'হিন্দু সংগঠনে' যাঁরা উদ্যোগী একে উপেক্ষা করার তাদের উপায় নেই।

ইতিহাসের তর্ক কম নয়। এ জাতিভেদ তো হিন্দু সমাজে হাজার হাজার বছর রয়েছে। আর হিন্দু সভ্যতা আজও টিকে আছে। কোথায় অন্য সব প্রাচীন সভ্যতা! হিন্দু সভ্যতা যে টিকে আছে, অর্থ তার যাই হোক, আর এককালে যে সে সভ্যতা গৌরবের ছিল সেটা জাতিভেদের ফল নয়, জাতিভেদ সত্ত্বেও অন্য গুণে এবং পারিপার্শ্বিকের অনুকুলতায়। বাইরের আঘাত যেই প্রবল হয়েছে অমনি ওই দুর্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। শরীরে অনেক রোগের বীজ থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে থাকে মোটামুটি সুস্থ অবস্থায়, শরীরের অন্য শক্তি যতদিন রোগের বীজ চেপে রাখতে পারে, এবং পারিপার্শ্বিক যতদিন বীজ থেকে রোগ প্রকাশের অনুকুল ক্ষেত্র তৈরি না করে। যখন যা ঘটে তখন জীবনযাত্রার প্রণালী বদলাতে হয়, রোগ প্রতিষেধের বিশেষ উপায় করতে হয়। সহজ কথা অবস্থা বদলেছে, বাঁচতে হলে ব্যবস্থা বদলাতে হবে। সেইজন্য হিন্দুর ‘স্মৃতি’ বার বার বদল হয়েছে, এক এক মুনির সঙ্গে অন্য মুনির মতের মিল নেই।

তর্কটা যখন পণ্ডিত লোকেই তোলে তখন দু-একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অবান্তর নয়। হিন্দুর জাতিভেদের আজ যে চেহারা, ভাতের হাঁড়ির শুচিতা, ও বিবাহে পাথরের বেড়া, হিন্দু সভ্যতার গৌরবের দিনে তার এমন আকার ছিল না। আপস্তম্বের স্মৃতিতে দেখি পাকটা ছিল আর্যাশ্রিত শূদ্রের কাজ, কেবল নামটা দেওয়া হয়েছিল। পাকযজ্ঞ। অনুলোম বিবাহ হিন্দু সভ্যতার গৌরবের শেষ যুগ পর্যন্ত চলতি ছিল; স্মৃতি গ্রন্থের পাতায় নয়, সামাজিক ব্যবহারে। একটা দৃষ্টান্ত দিই বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক; হিন্দু সভ্যতার গৌরবের শেষ যুগ, অনেকের মতে সবচেয়ে গৌরবের যুগ যখন সে

সভ্যতা এশিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। বাণভট্টের বংশ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশ। যার পরিচয়ে তিনি ‘কাদম্বরী’র প্রস্তাবনা শ্লোকে বলেছেন যে, অনেক গুপ্ত রাজারা তার পূর্ব-পুরুষের পাদপল্লব অর্চনা করেছেন। তাদের বাড়ির পোষা শুকপক্ষীও ক্রমাগত তন শুনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করত। সেই বাণভট্ট ‘হর্ষচরিতে’ বিনা দ্বিধায় লিখেছেন যে, তিনি তার পিতার ব্রাহ্মণী পত্নীর পুত্র, কিন্তু তাঁর আর দুটি ভাই আছে যাঁরা তাঁর পিতার শূদ্র স্ত্রীর সন্তান; তাদের নামও তিনি দিয়েছেন। সেদিনকার উচ্চ ব্রাহ্মণ সমাজে যদি এমন বিবাহে বিন্দুমাত্রও দোষ বর্ণনা থাকত, বাণভট্ট সে কাহিনি কখনই লিখতেন না।

কিন্তু বায়লজি’ কি এ প্রস্তাবের বিরোধী নয়? হিন্দুসমাজে এই যে উচ্চ জাতি নিচু জাতির ভেদ একি কতকগুলি বিশেষ শ্রেষ্ঠ গুণকে রক্ত মিশ্রণে লোপের আশঙ্কা থেকে বঁচিয়ে চিরকালের জন্য রক্ষা করার ব্যবস্থা না? এ ভেদ তুলে দিয়ে একাকার করলে কি বহুকালের গুণের পুঁজি তছরূপ হবে না? বাঙালি ব্রাহ্মণ ও বাঙালি শূদ্রের দিকে তাকিয়ে, ও শিক্ষা সমান পেলেও তাদের বুদ্ধির তারতম্যে, যাঁরা জাতির তফাত দেখতে ও ধরতে পারেন, তাঁরা নিশ্চয় অসামান্য লোক! বাঙালি ব্রাহ্মণের ফরসা চামড়া, কটা চামড়া, কাককৃষ্ণ চামড়া; উচু নাক, খাদা নাকি; লম্বা মাথা, গোল মাথা সব দেখেও তাদের রক্তের বিশুদ্ধতায় যাঁরা বিশ্বাস হারান না, তাদের বৈজ্ঞানিক মতের দৃঢ়তাও অসাধারণ। মানুষে মানুষে ভেদ আছে, বুদ্ধির শক্তির, নানা পটুতার যা জন্মগত; কোনও শিক্ষার বলে সে ভেদ লোপ করা যায় না। এর চেয়ে স্পষ্ট সত্য আর কী আছে! কিন্তু যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে হিন্দুর জাতিভেদ মানুষে মানুষে এই স্বাভাবিক প্রভেদের রেখা ধরে নিজের গণ্ডি এঁকেছে। তাঁরা ‘বায়লজি’র নাম নেন বৃথা। বায়লজি’ কেবল প্রমাণ করবে

যে এই কল্পনার সঙ্গে পরীক্ষিত সত্যের, সুতরাং বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। জাতিভেদ তুলে দিলে হিন্দু সমাজ একাকার হবে না। অন্য আর সব সমাজের মতো নানা স্বাভাবিক ভেদ বজায় থাকবেই। যেমন শিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে অশিক্ষিত পরিবারের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটবে কদাচিৎ।

এবং শিক্ষিত হবার সামর্থই প্রমাণ দুই পরিবারের জন্মগত গুণের অমিশ্রেয় প্রভেদ কিছু বর্তমান নেই।

প্রাচীন হিন্দু আচার্যেরা জাতিভেদের গুহাস্থিত এই 'বায়লজির তত্ত্ব অবশ্য অবগত ছিলেন না। মনুর 'ভাষ্যে' মেধাতিথি প্রশ্ন তুলেছেন ব্রাহ্মণ জাতি ও শূদ্র জাতির এই যে ভেদ এ কেমন ভেদ? একি গোজাতি ও অশ্বজাতির যে দৃষ্ট ভেদ, তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায়, সেই রকম ভেদ, অবশ্য নয়; কারণ দেখে কেউ বলতে পারবে না কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র। সুতরাং এ ভেদ অদৃষ্ট শাস্ত্রীয় ভেদ, লৌকিক জ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এ কালের সনাতন পন্থীরা মীমাংসকদের লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের তফাত মানে না। হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সুবিধা পেলেই তাঁরা রাজি। প্রাচীন ঋষিদের অভ্রান্ত জ্ঞানের উপর তাদের অগাধ ভক্তি, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড়বাদের উপর তাদের অসীম অবজ্ঞা। কিন্তু ও বিজ্ঞানের কোনও কিছু তাদের সনাতন মতের সমর্থন মনে হলেই তৎক্ষণাৎ তা লুফে নেন। কিছু আশ্চর্য নয়। তাঁরা আঁকড়ে থাকতে চান তাদের সংস্কারগুলিকে, বিনা বিচারে ও বিশ্লেষণে। যদি ঋষিবাক্য পাওয়া যায় ভালই। আর যদি জড়বাদী, ম্লেচ্ছ বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পাওয়া যায় সেভি আচ্ছা।

যাঁরা বলেন জাতিভেদ হিন্দু ধর্মের অত্যাজ্য অঙ্গ, ওকে না মানলে ধর্ম হানি হয়, এবং ঐহিকের সুবিধার জন্য পারিত্রিক ক্ষতি মুর্খতা তাদের কোনও তর্কই নেই। বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে হিন্দু বঁচুক কি মরুক সেটা বড় কথা নয়, জাতিভেদের শুচিত রক্ষা তার চেয়ে অনেক বড় কথা। তাঁরা সে শুচিত সযত্নে রক্ষা করুন। তাদের অশূদ্রস্পষ্ট স্বর্গের দরজা কেউ অববোধ করবে না।

৯

এত কালের অভ্যস্ত প্রথা বর্জন করতে বহু তর্ক ও বহু আন্দোলনের ফলেও সমস্ত বাঙালি হিন্দু একমত হবে সে আশা কেউ করে না। এবং এখানে ওখানে দু-চার জন ন্যায় ও ধর্ম বোধে জাতি বর্জন করলে তাঁরা একঘরে হওয়া ছাড়া বাঙালি হিন্দু সমাজের উপরে তার অন্য ফল আর কিছু ফলবে না। বাঙালি হিন্দুর মধ্যে এ সংস্কার আনার পথ ওকে জাতীয় আন্দোলনের অংশ করা। যাঁরা মনে করে এবং আন্দোলন আলোচনার কালে মনে করবে: ও-ভেদের লোপ জাতির জীবন ও সৃষ্টির জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন তাদের দল বেঁধে ওকে বর্জন করতে হবে। হিন্দু থেকে ও হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করতে হবে। প্রথম থেকেই সে দল ছোট হবে না, এবং তাকে একঘরে করার চেষ্টা হবে অর্থহীন। দলাদলি অবশ্যই আরম্ভে থাকবে কিন্তু মনে হয় বেশি দিন নয়। ও সংস্কারের মধ্যে সত্যের ও মনুষ্যত্বের যে ভিত্তি এবং প্রয়োজনের যে

তাগিদ আছে তাতে অল্প দিনের মধ্যে বিরোধীরাই হবে একঘরে। এবং ফল দেখে চোখের তুলি একবার খুললে স্বাভাবিককেই মনে হবে স্বাভাবিক।

এ কাজ অবশ্য আরম্ভ করতে হবে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুর। জাতের গণ্ডি তাঁরা না তুললে শুধু তাদের উপদেশ নিম্নশ্রেণির হিন্দু নিজেদের সব অদ্ভুত ভেদ তুলে দেবে এ মনে করা মূঢ়তা। উচ্চ শ্রেণির হিন্দু অনুকরণেই বাঙালি নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মধ্যে জাতির বিভাগ হচ্ছে আদিম cell এর মতো। এক হচ্ছে দুই, দুই হচ্ছে চার। এবং বিবাহের ক্ষেত্র সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে বহু শ্রেণির হিন্দু চলেছে লোপের মুখে। উপদেশ বৃথা। নিজের জাত তুলে দিয়ে জাত যে তোলা যায় তা দেখাতে হবে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।' জাতিভেদের উচ্ছেদে বাঙালি হিন্দু যে কেবল নিজেদের যথার্থ এক মনে করে গাঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ হবে তা নয়। ওই সংস্কারের চেষ্টায় ও ফলে তার মধ্যে যে শক্তি আজ রুদ্ধ আছে তা প্রকাশের পথ পাবে। এবং তাতে বাঙালি হিন্দুর হবে নবজন্ম, নবশক্তি ও নবদৃষ্টি নিয়ে। বাঙালি হিন্দু আধুনিক ভারতবর্ষকে ভাব ও আদর্শ কম দান করেনি। তার এ চেষ্টা সফল হলে ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর উপর তার ফল ফলতে দেরি হবে না।

১০

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। অনেকে মনে করেন এ যুদ্ধ ক্রমে পৃথিবীব্যাপী হবে, এবং ভরসা করেন তার ফলে মানুষের মধ্যে আসবে এক নবযুগ–'নিউ অর্ডার'। জাতির সঙ্গে

জাতির ও দেশের সঙ্গে দেশের অত্যাচারী অত্যাচারিতের সম্পর্ক আর থাকবে না। পৃথিবীর মানুষ হবে এক গোষ্ঠী, সকলের দরদে হবে সকলে দরদি। এমন যদি ঘটে। তবে কথাই নেই। কোথায় থাকবে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, আর কোথায় থাকবে বাঙালি হিন্দুর জাতিভেদ ও দুর্বলতা। মহাযুদ্ধের মহামাজিকে ও সব ছোটখাটো ব্যাপার কোথায় তলিয়ে যাবে লক্ষই হবে না। বিনা চেষ্টায় আপনা। আপনি হয়ে যাবে তাদের মীমাংসা।

মানুষের বাইরের ও মনের সভ্যতাকে ধাপে ধাপে টেনে তুলতে হয় প্রাণান্ত পরিশ্রমে। কখনও এক ধাপ উঠে আবার নীচে গড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমের শেষ নেই, আশা ভঙ্গেরও অবধি নেই। যুগ-যুগান্তব্যাপী এই সংগ্রাম জয় হয়ে যাবে একটা মাত্র বিরাট হত্যাকাণ্ডেকারনা আকাঙ্ক্ষা যায় বিশ্বাস করতে! মিরাকলে' বিশ্বাসের তাই তো মূল।

কুরুক্ষেত্রের ফলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দাম্ভিক দুর্যোধনের রাজ্যহানি ও মৃত্যু এবং মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের জয় ও রাজ্যলাভ এ ছাড়া সে ধর্মরাজ্যের স্বরূপ কী ছিল বেদব্যাস কিছু বলেননি।

রাও বিল

রাও কমিটির প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বা সংহিতার প্রধান লক্ষ্য দুইটি–(১) ব্রিটিশ ভারতের হিন্দুরা এখনও যেসব বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু আইন দ্বাবা শাসিত সেসব বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর জন্য এক আইনের প্রবর্তন; (২) প্রাচীন হিন্দু আইনের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী যে সকল সংস্কার বা পরিবর্তন প্রয়োজন, সেই সকল সংস্কার ও পরিবর্তনেব ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্য দুইটির প্রথমটি ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত হিন্দুকে এক অখণ্ড হিন্দুজাতিরূপে পরিণত করার একটি বড় উপায়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দুর মধ্যে বর্তমান অবস্থায় ধর্ম ছাড়াও অন্য যোগসূত্র নিতান্ত প্রয়োজন। দেশের মধ্যে হিন্দু সংগঠনের যে কথা শোনা যায়, সেই সংগঠনের এ একটি প্রধান উপায়। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর জন্য এক আইন প্রবর্তনের উপায়–বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে এক আইনের রূপ দেওয়া।

রাও কমিটির প্রস্তাবিত সংহিতার দ্বিতীয় লক্ষ্যটি এইজন্য প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যশাসনের প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে উপায়ে হিন্দু আইনের সংস্কার হত সে সব উপায় এখন অসম্ভব হওয়ায় হিন্দু আইনের স্বাভাবিক পরিণতি ও সংস্কারের ধারা বন্ধ হয়েছে। আইনসভায় হিন্দু আইনের সংস্কার না করলে বর্তমান কালোপযোগী তার সংস্কার আর সম্ভব নয়।

রাও কমিটির প্রস্তাবিত সংহিতা সম্বন্ধে যে সব আন্দোলন ও আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে দুইটি বিষয় নিয়েই সচরাচর আলোচনা দেখা যায়–(১) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন; (২) হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে রাও কমিটির প্রস্তাবের মর্ম এই রকম : নিকট সম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি দায়ভাগের অনুসরণ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি মিতাক্ষরার অনুসরণ। কারণ, নিকট সম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে দায়ভাগের বিধান মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার অধিকতর অনুরূপ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মানুষের বিশেষ কোনও স্বাভাবিক ইচ্ছা! থাকে না। সেখানে একটি ন্যায়সম্মত সরল বিধিরই বিশেষ প্রয়োজন এবং মিতাক্ষরার বিধি এইরূপ ন্যায়বিধি ও দায়ভাগের বিধির চেয়ে অনেক সরল।

দ্বিতীয়ত, রাও কমিটির প্রস্তাবে স্ত্রীসম্পর্কীয়দের উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রচলিত আইনের তুলনায় বেশি স্বীকার করা হয়েছে। এই স্বীকারের বিরুদ্ধেই বিরুদ্ধমত সবচেয়ে প্রবল। বিশেষত, বাপের সম্পত্তিতে মেয়েকে ছেলের অর্ধেক অংশ দিবার যে প্রস্তাব তার বিরুদ্ধেই বিশেষ আপত্তি। আপত্তিকারীগণ বলেন যে, এতে হিন্দুর সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হয়ে হিন্দুর আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটবে। এই আপত্তি ও আশঙ্কা ভিত্তিহীন। আপত্তিকারীগণ ভুলে যান যে, সম্পত্তির যাতে ভাগ বেশি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য করেই হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন রচিত হয়নি। তা হলে পিতার এক পুত্র অথবা দুই পুত্র মাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তি পাবে, এইরূপ বিধান হত। সেইরূপ বিধানের অনুবর্তন প্রয়োজন, একথা কোনও আপত্তিকারী এ পর্যন্ত বলেননি। উত্তরাধিকার আইনের একটি

প্রধান লক্ষ্য–যাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়, তাদের উত্তরাধিকারী করা। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই উত্তরাধিকারের একমাত্র, এমনকী প্রধান উদ্দেশ্য নয়। বাপের বিষয়ে মেয়ের অংশ ও সে অংশ ছেলের অর্ধেক নির্ধারণ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। যাঁরা এই ব্যবস্থায় হিন্দুর আর্থিক অবনতির আশঙ্কা করেন, তাঁরা সম্ভব ভেবে দেখেননি যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে এবং বহু দেশে ছেলে ও মেয়ের একসঙ্গে উত্তরাধিকার প্রচলিত আছে এবং তাতে তাদের আর্থিক অবস্থা হীন হয়েছে, এর কিছুমাত্র প্রমাণ নেই। কেহ কেহ আপত্তি তুলেছেন, মেয়েরা যখন স্বামীর উত্তরাধিকারিণী তখন তাদের পিতার উত্তরাধিকারিণী করা উচিত নয়। একজনের উত্তরাধিকারিত্ব অপর জনের উত্তরাধিকারিত্বে বাধা হওয়া কোনও ন্যায়ই সমর্থন করে না-যেমন একথা কেহ বলে না যে, ছেলে যখন পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীতখন তাকে মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা উচিত নয়।

স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে রাও কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তাদের নির্বাািঢ়স্বত্ব স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃত কথা, এক দায়ভাগশাসিত বাংলাদেশ ছাড়া মিতাক্ষরাশাসিত সমস্ত ভারতবর্ষেই এইরূপ নির্বাািঢ়-স্বত্বই স্বীকৃত। মিতাক্ষরাকার সুস্পষ্টভাবে সেই ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র প্রিভি কাউন্সিলের নজির সমস্ত ভারতবর্ষের স্ত্রীউত্তরাধিকারীগণের সেই স্বত্ব লোপ হয়েছে। দায়ভাগ প্রচারিত স্ত্রী-উত্তরাধিকারীগণের জীবন-স্বত্বের বিধি–যা শাস্ত্রৰলে নয়, প্রিভি কাউন্সিলের নজিরবিলে এখন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত আইন, তার ফল যে কিছুমাত্র মঙ্গলকর নয়–তা প্রত্যেক

আইনব্যবসায়ী অবগত আছেন। এ নিয়ে যে মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তা স্ত্রীউত্তরাধিকারীগণের নিরর্থক ক্লেশকর। সম্পত্তির শেষপুরুষ— অধিকারীর যে পুরুষ ওয়ারিশগণের হিতার্থে এই জীবনস্বত্ব কল্পিত, তাঁরা প্রায়শই দূর সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাদের অনুকুলে নিজের অত্যন্ত নিকট স্ত্রী-ওয়ারিশগণের সম্পত্তিভোগে বাধা জন্মানোর কিছুমাত্র অর্থ নেই। কয়েক বছর হল এক প্রস্তাবিত আইনে মা ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। মা যেখানে নিজের জীবনান্ত এই উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সম্পত্তি ছেলের জন্য মা রেখে বিক্রি করবেন, ধরে নেওয়া যেতে পারে শতকরা নব্বইটি জায়গায় উপযুক্ত কারণ আছে।

২

এই উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে অনেক হিন্দুর মনে একটা ভুল বিশ্বাস আছে। তাঁরা মনে করেন যে, হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন হিন্দুধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইনের পরিবর্তনে হিন্দুর ধর্মে আঘাত লাগবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা-প্রসূত! দায়বিভাগ বিধি ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায়ের অন্তর্বতী। ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহাব অধ্যায় যাকে ইংরেজিতে রিলিজিয়ান বলে, তার অন্তর্গত নয়। কারণ, ধর্মশাস্ত্র-বেত্তাগণ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্যবহারবিধি ও উত্তরাধিকার বৈদিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ওদের ভিত্তি অর্থশাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধি। সুতরাং উত্তরাধিকার বিধির পরিবর্তনে হিন্দুর ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নে কোনও আঘাত লাগে না। লোক ব্যবহারের উপর যার প্রতিষ্ঠা, লৌকিক অবস্থার পরিবর্তনে তার পরিবর্তন না ঘটলে লোকযাত্রা ও সমাজযাত্রা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয় না।

সেই জন্য দায়ভাগকার জীমূতবাহন বাংলাদেশে অন্যত্র প্রচলিত উত্তরাধিকারবিধির পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন।

কথাটার একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

৩

হিন্দু দায়াধিকার বিধি হিন্দুধর্মের অঙ্গ; সুতরাং তার পরিবর্তনে ধর্মে আঘাত লাগে এই বিশ্বাসের মূলে আছে একটা ভুল ধারণা। সে ধারণা হচ্ছে–হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম কথাটা ইংরেজি রিলিজিয়ান শব্দের সমর্থবাচক। এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে ধর্মশাস্ত্র কি তার টীকাকারদের মত থেকে নয়, কয়েকজন ইউরোপীয় লেখকের গ্রন্থ থেকে। এই সব লেখক হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে অপ্রমাণের জন্য একটি মত খাড়া করেছিলেন। হিন্দুর আইন তার ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়ান থেকে পৃথক হয়ে পরিণতি লাভ করেনি। সকল সমগ্রজেই আদিতে ধর্ম ও আইন অবিশ্লেষিত অবস্থায় থাকে। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়ান থেকে আইন স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। এইসব ইউরোপীয় লেখকেরা প্রচার করেছিলেন যে, হিন্দু সভ্যতা এই শেষ স্তরে পৌঁছতে পারেনি। হিন্দুর রিলিজিয়ন ও আইন চিরদিন অবিশ্লেষিত অবস্থায় থেকে গেছে। ইংরেজ লেখক হেনরি মেইন এই মতের একজন প্রধান প্রচারক। তার প্রাচীন আইন বা ‘এনসেন্ট ল’ নামক পুথি আমাদের দেশের আইন পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পড়তে হয়। এই পুথিতে মেইন তার মত প্রচার করেছেন। হিন্দু সভ্যতার কুৎসাকারীদের এই মতকে সাহেবের লেখা বলে

কোনও অনুসন্ধান না করেই আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। এবং গর্বের সঙ্গে প্রচার করছি যে, আমরা হিন্দুরা ধমপ্রাণ জাতি, আমাদের যা কিছু সবই ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকারগণ ও ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাত নিবন্ধকারগণ রিলিজিয়ন ও আইনের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা নির্দেশ করেছেন। ওর প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক, দ্বিতীয়টি লৌকিক। একই ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থে এই উভয়বিধ জিনিসের আলোচনা আছে, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা আছে। ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম কথাটির অর্থ 'কর্তব্য'। কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিধি ও নিষেধ ধর্ম শব্দের অর্থ।

মনুসংহিতার আরম্ভে আছে, ঋষিগণ ভগবান মনুর কাছে উপস্থিত হয়ে তার কাছে সমস্ত ধর্ম আনুপূর্বিক জানতে চেয়েছিলেন। সেই ধর্ম শব্দের ব্যাখ্যায় মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখেছেন: 'ধর্ম শব্দঃ কর্তব্যতাবাচনঃ। ধর্ম শব্দঃ কর্তব্যাকর্তব্যয়োবিধি প্রতিষেধয়ো দৃষ্ট প্রয়োগঃ।' এর অর্থ পূর্বেই বলেছি। এই যে কর্তব্য ও অকর্তব্য এটা হিন্দুর ঐহিক ও পা িরত্রিক সমস্ত রকম কর্তব্য ও অকর্তব্যকে সূচিত করে। যে সকল করণীয় ও অকরণীয় ঐহিক নয় পারিত্রিক, সেগুলি রিলিজিয়ন অর্থে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। আর যে কর্তব্য ও অকর্তব্য ঐহিক তাঁরা ধর্ম; কিন্তু নন-রিলিজিয়স। রিলিজিয়ন অর্থে যে ধর্ম তার মূল হচ্ছে বেদ। আর যে ধর্ম নন-রিলিজিয়স তার মূল বেদ নয়, তার মূল লোকাচার ও লোকপ্রসিদ্ধি। বেদ হচ্ছে সেই ধর্মের প্রমাণ যা অন্য কোনও প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না। বেদ শব্দের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি লিখেছেন–'বিদন্তি অনন্য প্রমাণ বোদ্যং ধর্মলক্ষণমর্থমন্মাদিতি বেদঃ' অর্থাৎ যে ধর্মের বিষয় অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয় অন্য কোনও প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না। তাই জানিয়ে দেয় বলেই বেদের নাম বেদ–যেমন

অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে স্বর্গলাভ হয়। অন্য কোনও প্রমাণেই তা জানা যায় না, সুতরাং এখানে বেদই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মানুষের মঙ্গল কি অমঙ্গলের যে সকল উপায় লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় সেটা বেদের বিষয় নয়, লৌকিক জ্ঞানের বিষয়। কারণ সেখানে বেদের কোনও প্রয়োজন নেই। মেধাতিথি লিখেছেন–'শ্রেয়ঃ সাধনং কৃষি সেবাদি ভবতি। পুরুষস্য কর্তব্য ত্বস্য চ তৎসাধনস্বভাবঅন্বয় ব্যতিরোেকাভ্যামবগম্যতে। যাদৃশেন ব্যাপারেন। কৃষ্যাদেঃ বৃহ্যাদিসিদ্ধিঃ সাপি প্রত্যক্ষাদবগম্য এব। যাগাদেস্তু সাধনত্বং যেন চ রূপেন অপূর্বোৎপত্তি ব্যবধানাদিনা তন্ন প্রত্যক্ষাদি অবগম্যম' অর্থাৎ 'কৃষি ও চাকুরি করে' মানুষের শ্রেয় সাধন হয় এ জ্ঞান লৌকিক, অন্বয়-ব্যতিরেকে প্রমাণ দ্বারাই লোকে জানতে পারে। কি উপায়ে কৃষিকার্যের ফলে ধান প্রভৃতি ফসল ফলান যায় তা প্রত্যক্ষ প্রমাণেই মানুষ জানতে পারে। কিন্তু যাগযজ্ঞাদির ফলে যে এক অপূর্ব-ফলোৎপত্তি হয়ে পরকালে মানুষকে সুফল দেয় তা প্রত্যক্ষাদি কোনও লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় না। সুতরাং এখানে বেদ প্রমাণ। কৃষি ও চাকুরিতে মানুষের ফললাভ, কি চাষের উপায়–এই জ্ঞানের প্রমাণ বেদ নয়। বেদে যদি এ সম্বন্ধে কোনও কথা থাকে। তবে তা প্রসঙ্গত, মীমাংসকদের ভাষায়, অনুবাদ মাত্র। প্রকৃত বেদ অর্থাৎ বিধিনিষেধেরত অঙ্গ নয়।

যে সকল ধর্মসংহিতা সম্পূর্ণাঙ্গ তাদের তিনটি ভাগ। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির তিন অধ্যায়— আচার অধ্যায়, ব্যবহার অধ্যায় ও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়। মনুসংহিতায় এই তিন ভাগ আছে। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিব অধ্যায় ভাগ করে তাদের বিভাগ দেখানো হয় নাই। মনুসংহিতার শেষ বা দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে। এই দুটি প্রধান সংহিতা

বা ধর্মশাস্ত্রে আচার ও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায় ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশমূলক অধ্যায় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহার অধ্যায় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

বেদ প্রমাণে ও অন্য লৌকিক প্রমাণে কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মেধাতিথি লিখেছেন যে, ‘অন্যত্র যেমন ব্যবহার স্মৃতি প্রভৃতিতে জ্ঞান ন্যায়মূল, অর্থাৎ বেদমূল নয়, তা ক্রমে প্রদর্শিত হবে।’ ‘অন্যত্রাপি ব্যবহার স্মৃত্যাদৌ যাত্র ন্যায়.মূলতা স্তত্র যথাবসরং দর্শায়িষ্যাম।’ এবং মনুর সপ্তম অধ্যায়ে, যেখানে রাজধর্মের বিবরণ আরম্ভ হয়েছে সেখানে মেধাতিথি লিখেছেন, ‘প্রমাণান্তরমূলোহি অত্র ধর্মী উচ্যন্তে। ন সর্বে বেদমূলাঃ।’ অর্থাৎ, এখানে যে ধর্ম বলা হচ্ছে, তার মূল অন্য প্রমাণ, এই ধর্মের সমস্ত বেদমূল নয়।

শাস্ত্রকারেরা এবং নিবন্ধকারগণ কেন যে ব্যবহার স্মৃতিকে বেদমূল নয় বলেছেন এবং অন্য লৌকিক প্রমাণ সাপেক্ষ বলেছেন তার কারণ ব্যবহার স্মৃতি কোনও বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ–তার উপর একটু চোখ বুলালেই বুঝা যায়। ব্যবহার স্মৃতির বিষয় হচ্ছে আমরা এখন যাকে বলি মামলা মোকদ্দমা। মিতাক্ষরাকার লিখেছেন–’অন্য বিরোধেন স্বাত্ম-সম্বন্ধিতয়া কখনং ব্যবহারো, যথা কশ্চিদিদং ক্ষেত্রাদি মদীয়ং ইতি কথয়তি। অন্যেপিতদবিরোধেন মদীয়ং ইতি’ অর্থাৎ একই বস্তুতে দুই ব্যক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ স্বত্বের দাবির নাম ব্যবহার–যেমন যদি একজন লোক বলে এ শস্যক্ষেত্র আমার ও অন্য লোক বলে ওই শস্যক্ষেত্র তার, তা হলে তাকে বলে ব্যবহার।

ব্যবহার স্মৃতির কাজ সাংসারিক ভোগের বস্তুতে বিভিন্ন লোকের বিরোধী দাবির বিচারের উপায় নির্ণয় করা। সুতরাং ও স্মৃতিতে আছে, রাজার বিচারসভায় কারা সভ্য

হবেন, কি প্রণালীতে তাঁরা বিচার করবেন, কোন প্রমাণ গ্রাহ্য, কোন প্রমাণ অগ্রাহ্য এবং যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে লোকের বিরোধী দাবি হতে পারে, মোটামুটি তাকে ১৮ ভাগে ভাগ করে তার আইনের ব্যবস্থা। স্মৃতিশাস্ত্রে এর নাম 'অষ্টাদশ বিবাদ পদানি।' এর মধ্যে আছে— ঋণ, তার সুদ ও তার পরিশোধের আইন, নানাবিধ চুক্তির আইন, ক্রয় বিক্রয়ের আইন, জমির সীমা নিয়ে বিবাদের আইন, নানারকম অপরাধের ফৌজদারি আইন ইত্যাদি। অর্থাৎ মোটামুটি প্রাচীন হিন্দু আইন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ আদালতে ইংরেজের প্রবর্তিত আইন দ্বার যেসব বিষয়ের বিচার হিন্দু, কি মুসলমান আজ মেনে নিচ্ছে। এতে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হয়েছে, অতি বড় সনাতনীও এমন কথা বলেন না।

এই সকল নিতান্ত লৌকিক বিষয়, যার ফলাফল ও মঙ্গলামঙ্গল হাতে হাতে পাওয়া যায় এবং মানুষের স্বাভাবিক লৌকিক জ্ঞানে যে বিধিব্যবস্থা করা যায়, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কি তাদের ভাষ্যকারেরা তা রিলিজিয়নের অঙ্গ সুতরাং অপরিবর্তনীয় একথা কখনও মনে করেননি। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের ভার তাদের উপর ছিল। সুতরাং কাণ্ডজ্ঞানহীন গোড়ামি করার অবসর তাদের ছিল না। তার উপর তাঁরা ছিলেন তীক্ষ্ণ ধী-সম্পন্ন, সাংসারিক জ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান পণ্ডিত। সেইজন্য তাঁরা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্যবহার স্মৃতি লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক ব্যবহারের উপর স্থাপিত।

হিন্দুর দায়বিভাগ এই ব্যবহার স্মৃতির অন্তর্গত। সুতরাং এর মূল বেদ নয় এবং রিলিজিয়ন অর্থে দায়ভাগ হিন্দুধর্মের অঙ্গ নয়। স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে একটা তর্ক প্রচলিত ছিল— বস্তুর উপর স্বামিত্ব, কি স্বত্ব, শাস্ত্র-প্রমাণের বিষয়, না লোক-প্রসিদ্ধির বিষয়। সকল স্মৃতিকার একবাক্যে বলেছেন যে, বস্তুর উপর স্বত্ব কি স্বামিত্ব শাস্ত্র-প্রমাণের বিষয় নয়, লৌকিক স্বীকৃতির বিষয়। মিতাক্ষরাকার বলেছেন যে, তা না হলে যে সকল অহিন্দু প্রত্যন্তবাসী শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রাহ্য করে না, তাদের মধ্যেও বস্তুর স্বামিত্ব স্বীকৃত হয় কি করে? যে সকল বিভিন্ন প্রকারে বস্তুতে লোকের স্বামিত্ব জন্মে, স্মৃতিশাস্ত্রে তার ফর্দ দেওয়া আছে। কিন্তু ভাষ্যকারেরা বলেছেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রে ওই ফর্দ আছে বলেই ওকে শাস্ত্রের বিধি বলে মনে করতে হবে না। মিতাক্ষরাকার এর উদাহরণে যা বলেছেন, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তা সকল সংশয় নিরসন করে। তিনি বলেছেন, 'যদ্যপি পত্নী দুহিত।রশচ ইত্যাদি স্মরণং তত্রাপি স্বামী সম্বন্ধিতয়া বহুর্মুদায়বিভাগিতয়া প্রাপ্তেষু লোকপ্রসিদ্ধেপি স্বত্বে ব্যামোহ নিবৃতার্থং স্মরণমিতি সর্বমনবদ্যং' অর্থাৎ যেমন পুত্রহীন লোকের ধনের কারা অধিকারী হবে, সে সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য 'পত্নী দুহিতরাশ্চা' ইত্যাদি বচনে নির্দেশ দিয়েছেন, তবু এটা শাস্ত্রের বিধি নয়, কিন্তু ধন স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কবশত বহু লোক তার সম্পত্তিতে অধিকার দাবি করতে পারে, এজন্য লোকের সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য এই বচন বলেছেন, যদিও এ দায়াধিকার বচনের উপর নয়– লোকপ্রসিদ্ধির উপর নির্ভর করে, তেমনি সম্পত্তি অর্জনের নানারূপ উপায় আছে। অন্য স্মতিশাস্ত্রে সে সব উপায় বলা হয়েছে, বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্যে নয়, লোক-প্রসিদ্ধ ব্যাপারের বর্ণনা হিসাবে।

এর পর যে দুটি বিখ্যাত শ্লোক যাজ্ঞবল্ক্য নির্দেশ করেছেন, কোন কোন স্বেপার্জিত সম্পত্তি উপার্জনকারী নিজে রাখতে পারবেন, পরিবারের সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে না। তার টীকার এক জায়গায় মিতাক্ষরাকার লিখেছেন যে, এই প্রকরণের বাচনগুলি প্রায়ই যা লোক-প্রসিদ্ধ ব্যবহার তারই অনুবাদ মাত্র অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধি নয়।

'অস্মিন প্রকরণে' 'এই প্রকরণে' যে প্রকরণের কথা মিতাক্ষরাকার বলেছেন, সে হচ্ছেদায়বিভাগ প্রকরণ। সুতরাং মিতাক্ষরাকারের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবহার অধ্যায়ের দায়ভাগ প্রকরণের বিধিগুলি বেদমূল নয়, অর্থাৎ হিন্দু রিলিজিয়নের অঙ্গ নয়, লোক-প্রসিদ্ধ ও লোক-ব্যবহার সে বিধির স্রষ্টা। মিতাক্ষরার অনেক পরবর্তী গ্রন্থ 'বীর মিত্রোদয়' সোজাসুজি বলেছেন, 'প্রায়েণ ব্যবহার-স্মৃতীনাং লোকসিদ্ধার্থনুবাদকত্বমিতি সকল নিবন্ধু ভিরভিধানাং', অর্থাৎ ব্যবহার স্মৃতির প্রায় বচনগুলি যা লোকসিদ্ধ তারই অনুবাদক–এই কথা সকল নিবন্ধকার বলেছেন।

যাঁরা আপত্তি তুলেছেন যে, হিন্দু দায়াধিকার বিধি পরিবর্তন করলে হিন্দুধর্মে আঘাত লাগবে, ধর্মশূন্ত্রকারগণ ধর্ম বলতে কি বুঝতেন, তার কাোনও খবর তাঁরা রাখেন না। রাষ্ট্র বা সমাজে কোর্সও কিছু পরিচালনের দায়িত্ব আমাদের নেই বলে সব কিছুতেই ধর্ম গেল। রব তোলা সম্ভব হয়েছে। সে দায়িত্ববোধ থাকলে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে দায়বিভাগের প্রচলিত বিধির পরিবর্তনে ধর্মহানির কথা কখনও উঠতে পারত না।

দায়ভাগ যে ধর্মের অঙ্গ–এই ভুল বিশ্বাস বাঙালির মনে হওয়ার একটা অতিরিক্ত কারণ আছে। বাঙালি হিন্দু জীমূতবাহনের দায়ভাগদ্বারা শাসিত। জীমূতবাহন অন্যত্র প্রচলিত দায়বিভাগক্রমকে পরিবর্তন করেছিলেন। সেই পরিবর্তনের জন্য তিনি একটা তর্ক আশ্রয় করেছিলেন। সে তর্ক হচ্ছে এই পার্বণ–শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে যে যত বেশি উপকার করে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে তার দাবি তত বেশি। পার্বণ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান হিন্দুর আচারধর্মের অন্তর্গত। সুতরাং মনে হতে পারে যে, দায়ভাগের দায়াধিকার বিধি হিন্দুধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দায়ভাগ গ্রন্থ যিনি পাঠ করেছেন, তিনিই জানেন যে, এই তর্কটা হিন্দুধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে জীমূতবাহন আদৌ মনে করেননি। এই তর্কটা জীমূতবাহন নিয়েছিলেন উদ্যোত নামা একজন পূর্বাচার্যের কাছ থেকে। উদ্যোতের কোনও গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দায়ভাগ থেকে যতদূর বোঝা যায়, কি উদ্যোত, কি জীমূতবাহন— দুজনেই এই তর্কটিকে ন্যায়ের যুক্তি বলেছেন, ধর্মের অনুশাসন বলেননি। জীমূতবাহন। এই কথা বলে তার বিচার শেষ করেছেন, 'তদর্জিত ধনস্য চ তদুপকারতারতম্যেন তদর্থ্য সম্পাদনস্য ন্যায্যত্বাৎ উপকারকৃত্বনৈব ধনসম্বন্ধো ন্যায়প্রাপ্তে মন্বাদীনামভিমতমিতি মন্যতে। অর্থাত্রাপরিতেষোবিদুষাং বাচনিক এবায়মর্থঃ।' অর্থাৎ যার ধন পিণ্ড দানের তারতম্যে তার উপকারের তারতম্য হয়। সুতরাং বেশি উপকারীর ধনের উত্তরাধিকার দাবি ন্যায্য ও ন্যায়প্রাপ্ত–যাজ্ঞবল্ক্য মনু প্রভৃতির এইরূপ অভিমত— ইহাই আমি মনে করি। এতেও অর্থাৎ এইরূপ তর্কেও যদি পণ্ডিতেরা তুষ্ট না হন, তা হলে বলি যে, মনু প্রভৃতির বচন থেকেও আমি যে উত্তরাধিকার ক্রম স্থাপন করেছি, তা পাওয়া যায়। এর টীকায় দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কলংকার বলেছেন, 'যতো ন্যায়মূলত্বে বিদুষামসন্তোেষঃ ততো বাচনিক এবার্থ ইতি' অর্থাৎ য়দি ন্যায়মূলক

এই তর্কে পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট না হন, তবু জীমূতবাহনের মত ঋষিদের বচন থেকেও পাওয়া যায়। এটা সুস্পষ্ট যে জীমূতবাহন তার দায়ক্রম বিধিকে বেদমূল বলেননি, বলেছেন ন্যায়প্রাপ্ত অর্থাৎ ন্যায়মূল। দায়ভাগের উত্তরাধিকারবিধি জীমূতবাহন হিন্দুধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নের উপর প্রতিষ্ঠা করেননি, করেছেন ন্যায়ের বা যুক্তির উপর।

অনেকে জানেন বাংলা ভিন্ন সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে মোটামুটি মিতাক্ষরা দ্বারা লোকে শাসিত, পার্বণশ্রাদ্ধে পিণ্ডের উপর দায়াধিকার নির্ভর করে না, নির্ভর করে রক্ত সম্পর্কের উপর। রক্ত সম্পর্কে যে যত নিকট মিতাক্ষরার মতে সে তত নিকট উত্তরাধিকারী। আশা করা যায়, রক্ত সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের বীজ কেহ খুঁজে বের করবেন না।

হিন্দুর দায়বিভাগ যে হিন্দুর ধর্মের অঙ্গ, এটা হিন্দু সভ্যতাকে খাটো করার জন্য পশ্চিম দেশে কোনও কোনও লেখক প্রচার করেছিলেন। আমরা সেই প্রচারকে প্রশংসাবাক্য জ্ঞানে মাথায় করে নিয়েছি। হিন্দু শাস্ত্রকর্তাগণ প্রকৃত কি বলেছেন, তা জানিবার জন্য আমাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। যে অনড় অবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, যা তার অনুকূলে তাই হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি-তাতে অনেকেই সন্দেহ করে না। কারণ, অনেক মানুষই—যা বিশ্বাস করলে মন খুশি হয়, তাই বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক হতে পারে, তা তাঁরা মনে করতে চায় না। কেউ প্রমাণ করে দেখালে তার উপর বিরক্ত হয় ও গালাগালি করে।

8

রাও কমিটির প্রথম খসড়ায় বিবাহকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল-শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহ। প্রচলিত হিন্দু বিবাহে যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, শাস্ত্রীয় বিবাহে সে সমস্তই বলবৎ রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবাব বর-কন্যার মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরিবর্তন কেবলমাত্র এইটুকু ছিল যে, বিবাহ হবে একপত্নীক, অর্থাৎ এক পত্নী বর্তমানে পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলবে না। প্রস্তাবিত লৌকিক বিবাহে অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবর বর-কন্যার বিবাহ বৈধ বিবাহ করা হয়েছিল। কেবল কতকগুলি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত বর-কন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য এই বিবাহও ছিল একপত্নীক। এই দুই শ্রেণির বিবাহে ব্যাবহারিক ফল একরকম হবে-এই নির্ধারণ ছিল। অর্থাৎ উভয় প্রকার বিবাহিত স্বামী স্ত্রী ও তাদের সন্তানসন্ততিরা এক হিন্দু দায়াধিকার আইনে শাসিত হবে। লৌকিক বিবাহের ফলে কেহ তার পরিবার থেকে বিচুত হবে না বা দেবোত্তর প্রভৃতির সেবাইতি থেকেও বঞ্চিত হবে না, দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা লোপ হবে না এবং লৌকিক বিবাহকারী পুত্রকে মৃত্যগণ্যে তার পিতার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা হবে না। হিন্দু বিবাহের এই দুই শ্রেণি ভাগের উদ্দেশ্য ছিল সনাতন-পন্থীদের আশ্বস্ত করা। শাস্ত্রীয় বিবাহে যখন চলতি সব নিষেধ বহাল থাকল। তখন একটা অশাস্ত্রীয় লৌকিক বিবাহ স্বীকারে ক্ষতি কি? কিন্তু এইরকম শ্রেণি ভাগের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি আছে, প্রথম-এই শ্রেণি ভাগের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। কারণ সনাতনীদের তুষ্ট করে যদি এ আইন পাশ করাতে হয়, তবে এ আইন পাশ হবে না। কারণ দুই রকম বিবাহের ব্যাবহারিক ফল যেখানে এক, আশাস্ত্রীয় লৌকিক বিবাহে পতি-পত্নীর হিন্দুর সমাজ ও ধর্মে সকল দাবি যখন সম্পূর্ণ বহাল থাকবে, তখন

সনাতনপন্থী তুষ্ট বা আশ্বস্ত হবে কীসে? সনাতনপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আইন যদি পাশ হয় তা হবে তাদের মতের জোরে যাঁরা সমগ্র হিন্দু সমাজের যুগোপযোগী পরিবর্তন চায়, সমাজের বিধিবন্ধন থেকে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি মাত্র চায় না। এই শ্রেণি বিভাগের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এবং যা প্রধান আপত্তি তা হচ্ছে—এই শ্রেণি ভাগ হিন্দু বিবাহবিধির সংস্কার নয়, হিন্দুকে হিন্দু বিবাহবিধি অগ্রাহ্য করে বিবাহের স্বাধীনতা দেওয়া। এইরকম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু সমস্ত সমাজের উপর তার ফল গৌণ ফল। হিন্দুর বর্তমান সমাজ এই গৌণ উপায়ে পরিবর্তনের চেষ্টার যুগ ছেড়ে এসেছে। এখন প্রয়োজন, সমস্ত সমাজের হিতে হিন্দুর সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবর্তন, যার ফলে হিন্দু সমাজ দৃঢ় গড়ন ও নুতন বল পাবে।

এই সব আপত্তির ফলে রাও কমিটি বর্তমান যে খসড়া প্রকাশ করেছেন, তাতে শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহের শ্রেণিভেদটা বহাল থাকলেও তার মধ্যে ভেদরেখা অতি অস্পষ্ট। এই শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহবিধির এক পরিবর্তিত ব্যবস্থার প্রস্তাব হয়েছে। সে বিধিতে অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবর বর-কন্যার বিবাহে বাধা নেই; বরকন্যা সপিণ্ড ও বিশিষ্ট নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত না হলেই হল। প্রথম খসড়ার একপত্নীক বিবাহের নিয়ম এতেও বহাল আছে। এই শাস্ত্রীয় বিবাহ ও প্রস্তাবিত লৌকিক বিবাহের মধ্যে প্রকৃত তফাত কিছুই নেই। সুতরাং এই লৌকিক বিবাহের প্রস্তাবটিকে প্রস্তাবিত হিন্দু বিবাহ আইন থেকে বর্জন করলে কিছুই ক্ষতি হয় না এবং তা করা উচিত। লৌকিক বিবাহ বা সিভিল ম্যারেজ ধর্মের গণ্ডির কোনও অর্থ নেই। সুতরাং সেই রকম

বিবাহকে হিন্দু বিবাহের অর্থাৎ ধর্মের গণ্ডির মধ্যে বিবাহের একটা শ্রেণি গণ্য করার কোনও অর্থ হয় না।

হিন্দু বিবাহ হিন্দুর ধর্মাচারের অঙ্গ। সুতরাং বিবাহ-বিধির পরিবর্তন এই আচারের পরিবর্তন। কাজেই এ আপত্তি উঠা কিছুই বিচিত্র নয় যে, বিবাহ-বিধির এ রকম পরিবর্তন হিন্দু ধর্মকে আঘাত করে। এ রকম আপত্তির উত্তর-হিন্দুর আচার প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। কারণ তা না হলে কোনও সমাজ বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। এই বিবাহ-বিধিতেই গৌতম স্মৃতির সময় বিভিন্ন বর্ণের বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সময় বর্ণগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ উচ্চবর্ণের বরের সঙ্গে নিম্নবর্ণ কন্যার বিবাহ বৈধ ছিল। সমাজ থেকে এই রকম অনুলোম বিবাহ খুব বেশি দিন লোপ হয়নি। ব্রাহ্মণের শূদ্রা পত্নী বিবাহ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য অবৈধ বলেননি; কিন্তু নিন্দা করেছেন। এই রকম বিবাহ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সময়ের পরেও যে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি : 'কদম্বরী'র গ্রন্থকার বাণভট্ট তার 'ইষ্টচরিতে' লিখেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এবং পিতার শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত তাঁর দুটি ভাই ছিল। অথচ বাণভট্ট গর্ব করে লিখেছেন যে, তার বংশ এই রকম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশ যে, তাদের বাড়ির শুক পাখিরাও শুনে শুনে বেদমন্ত্র গান করত। বাণভট্ট সত্য বা ত্রেতার লোক নন। মহারাজ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। অত্যন্ত আধুনিক গ্রন্থ, যেমন কালিকা পুরাণে কলিকালে কোন কোন আচার বর্জনীয়, তার ফর্দ আছে। এই ফর্দগুলিই প্রমাণ যে, হিন্দুর আচার যুগে যুগে পরিবর্তিত

হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি হয়তো ইচ্ছাকৃত আর কতক সময়ের ও অবস্থার চাপে। অবস্থার চাপে যে সামাজিক আচার পরিবর্তন করতে হয়, ব্রাহ্মণ নির্বিশেষে বর্তমান হিন্দু সমাজে কন্যার বিবাহের বয়স তার একটি প্রমাণ। অতিবড় সনাতনীও এখন কন্যার বিবাহের বয়সে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের বিধিনিষেধ মানতে পারেন না। সুতরাং হিন্দুর বিবাহ-বিধির সংস্কার বর্তমানে প্রয়োজন কি না, সেই কথাই বিবেচনার বিষয়; প্রাচীন আচার ও শাস্ত্রবিধি মাত্র তার নিয়ামক নয়।

প্রথম ধরা যাক, বর্তমান সমাজে অসবর্ণ বিবাহের নিষিদ্ধতা। প্রাচীন হিন্দু সমাজে যে বর্ণবিভাগ, তার সঙ্গে বর্তমান সমাজে বিবাহে জাতিভেদের গণ্ডি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বর্ণ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র–এই চারি বর্ণ বোঝা যায়। এখন যে জাতিভেদ বিবাহে বাধা, তা এই চারি বর্ণের ভেদ নয়; বহু জাতি ও উপজাতির ভেদ। এই ভেদ হিন্দু সমাজকে বহু ভাগে বিভক্ত ও নিতান্ত দুর্বল করেছে এবং দিন দিন বেশি দুর্বল করছে। এই জাতিভেদে বিবাহের বাধা উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা যাকে বলে নিম্নশ্রেণির হিন্দু, সেই নিম্নশ্রেণির হিন্দুজাতির সংখ্যা লাঘব করে ক্রমশ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এ যাঁর চোখ আছে, তিনিই দেখতে পাচ্ছেন। অথচ এই সকল বর্ণ ও জাতির মধ্যে বস্তুগত কোনও প্রভেদ খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব। মনুর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর লোক। তিনি তখনই প্রশ্ন তুলেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রে যে ভেদ, এ কী রকম ভেদ? এ কি গো ও অশ্বের মতো ভেদ যে চোখে দেখলেই চেনা যায়, কোনটা গোরু আর কোনটা ঘোড়া? কিন্তু চোখে দেখে তো চেনা যায় না, কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র। সুতরাং তিনি মীমাংসা করেছেন-এ ভেদ কোনও বস্তুগত ভেদ নয়। প্রাচীনকাল

থেকে আগত শাস্ত্রকৃত ভেদ মাত্র। আমাদের হিন্দু সমাজে জাতিভেদের ভিত্তি জাতির গণ্ডির বাইরে বিবাহে নিষিদ্ধতায়। এই নিষেধকে দূর না। করলে হিন্দু সমাজ কোনও দিনই দৃঢ়বদ্ধ এক সমাজ হয়ে গড়ে উঠবে না। এই নিষেধের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক যুক্তির নাম দিয়ে যা সব বলা হয়, সেগুলি যা আছে, তার সমর্থনে মনগড়া কল্পনা মাত্র; সত্যে তার কোনও ভিত্তি নেই। এই নিষেধকে বহাল রেখেও আমাদের জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে এড়িয়ে হিন্দু সমাজে সংহতি আনার আর যে সব চেষ্টাযেমন অ-জল-চল জাতির হাতে মাঝে মাঝে সভা করে, জল খেয়ে তাদের কৃতার্থ করা, বৎসরে একবার তাদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে ভোজন করে তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন—সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম-নিজের মন ও পরের মনকে ফাঁকি দেওয়া। এই জন্য হিন্দু বিবাহ বিধির সংস্কারে প্রথম প্রয়োজন হিন্দু বিবাহে বরকন্যার অসবর্ণত্বের বাধা দূর করা। সুতরাং রাও কমিটির শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহে এই বাধা দূর করার যে প্রস্তাব হয়েছে, হিন্দু সমাজের মঙ্গলকামী সকল হিন্দুর তা সমর্থন করা উচিত।

প্রচলিত হিন্দু বিবাহে সগোত্র ও সমান প্রবারের বাধার মতো অর্থশূন্য বাধা আর কল্পনা করা যায় না। গোত্র কাকে বলে? থিয়োরি হচ্ছে, জমদগ্নি প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ সকল ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। এই কয়েকজনের নামই গোত্র নাম। সুতরাং যে ব্রাহ্মণের বংশপরম্পরা যে গোত্র প্রসিদ্ধ, ধরতে হবে তিনি সেই নামের আদি পুরুষ ব্রাহ্মণের বংশধর। যদি স্বীকার করা যায় এ থিয়োরি সত্য এবং বহু শত পুরুষ পূর্বে সগোত্র স্ত্রীপুরুষ ব্রাহ্মণের এক পূর্বপুরুষ ছিল, কোন যুক্তিতে সেটা বিবাহে বাধা হতে পারে? সপিণ্ড বরকন্যার বিবাহে নিষেধের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, তারাই সপিণ্ড-এক

দেহ থেকে যাঁরা উদ্ভূত—'সপিণ্ডতাতু এক শরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি' (মিতাক্ষরা)। এই অনাদি সংসারে সকলের মধ্যেই এই রকম সপিণ্ডতা সম্ভব। কিন্তু সেটা অতি প্রসঙ্গ। কারণ তা হলে কোনও বিবাহই সম্ভব হয় না।-'তচ্চ সর্বত্র সর্বস্য যথা কথঞ্চিদ নাদৌ সংসারে ভবতাতি প্রসঙ্গঃ' (মিতাক্ষরা)। সুতরাং সপিণ্ড শব্দের অর্থকে নিতে হবে কাটছাট করে একটা নিয়মিত কার্যকরী গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে। 'পঙ্কজ' শব্দের অর্থ যেমন করা হয়

'অতশ্চায়ম সপিণ্ড শব্দোহ বয়বশক্ত্যা সর্বত্র প্রবর্তমানেতি নির্মস্থা পঙ্কজাদি শব্দবন্নিয়ত বিষয় এব' (মিতাক্ষবা)। এজন্য বিবাহের সপিণ্ডতা মাতার বংশে পাঁচ পুরুষ ও পিতার বংশে সাত পুরুষেই শেষ হয়। হিন্দু বিবাহে সগোত্র নিষেধের বিরুদ্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারদের এই যুক্তির সুষ্ঠতর প্রয়োগের ক্ষেত্র আর নেই। যেখানে রক্তের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত, সপিণ্ড সম্বন্ধে সীমার বাহিরে হলেও তার সঙ্গে বিবাহ চলে, আর সেই সীমার মধ্যেও কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা হলে তাকে বিবাহ করা যায়। কিন্তু যেখানে রক্ত সম্বন্ধের কোনও ইতিহাস নেই, কেবলমাত্র বংশপরম্পরাগত একটা নাম সাম্যই বিবাহের অলঙঘনীয় বাধা, এই রকম নিয়ম, যাঁরা কোনও কিছু বোঝাকেই ঘাড় ভেঙে গেলেও ঘাড় থেকে নামাতে ভরসা পায় না, তাঁরা ছাড়া আর কেউ সমর্থন করবে না। তা ছাড়া কল্পিত পূর্বপুরুষ সম্বন্ধ কেবল তো আছে ব্রাহ্মণের। সুতরাং শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রকৃত কোনও গোত্র থাকতে পারে না। পুরোহিতের গোত্র থেকেই তাদের গোত্র কল্পনা করা হয় এবং শূদ্রের বিবাহে কল্পিত সগোত্রও কোনও বাধা নয় : 'প্রাগুক্ত মনু শাতাতব বচনে দ্বিজাতি গ্রহণং সগোত্র বর্জনে শূদ্রাদ্যাবৃতার্থম' (উদ্বাহতত্ত্ব)।

প্রবরের ব্যাপারটা আরও একটু ঘোরাল। কাকে প্রবব বলে, তার প্রকৃত অর্থ বহুদিন থেকেই হিন্দু সমাজে পণ্ডিতদেরও জানা নেই। প্রতি গোত্রে অনেকগুলি করে আছে। সেগুলিও ব্যক্তিবিশেষের নাম। একটা প্রসিদ্ধি এই যে, প্রবর প্রবর্তক ঋষিরা গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের পুত্র পৌত্র। সুতরাং সগোত্র ও সমান প্রবারের লোকেরা খুব দূর সম্পর্কের হলেও এক বংশের লোক এবং যাদের প্রবর এক তাদের সম্পর্কটা ওরই মধ্যে একটু নিকট। কিন্তু মুশকিল। এই যে, ভিন্ন গোত্রেও এক প্রবারের নাম আছে, যেমন উপমনু গোত্রে এক প্রবর। বশিষ্ট আবার পরাশর গোত্রেরও এক প্রবর। বশিষ্ট অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রের লোক এক প্রবর হতে পারে। আমরা সবাই জানি যে, সেজন্যই সমান প্রবারের বাধা বিবাহে সগোত্রের অতিরিক্ত আর এক বাধা। এ কি করে সম্ভব? সেইজন্য মেধাতিথি বলেছেন-স্মৃতি যখন বলেছে তখন তা স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ ওটি অলৌকিক বস্তু, লৌকিক বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝা যাবে না। প্রকৃত কথা এই যে, ভাষ্যকার ও নিবন্ধকারদের সময় প্রবারের যথার্থ অর্থের স্মৃতিও লোপ হয়েছিল এবং নানা পরস্পরবিরোধী কল্পনা তার স্থান পূরণ করেছিল। যদি পাঠক রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে ধৃত মাধবাচার্যের প্রবারের ব্যাখ্যার সঙ্গে 'অসপিণ্ডাতু যা মাতুঃ সগোত্রাচ যা পিতুঃ' এই মনু বচনের মেধাতিথির ভাষ্য মিলিয়ে দেখেন তবে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে, কিন্তু এখনও আমরা এই বহুদিন মৃত প্রবারের বাসি মড়া ঘাড়ে করে কষ্ট পাচ্ছি এবং বিবাহের ক্ষেত্রকে অকারণে সংকীর্ণ করে সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনছি।

হিন্দু বিবাহে সপিণ্ডের মধ্যে বিবাহ নিষেধের বিধি নিকট সম্পর্কিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিবারণের নিয়ম। এই নিষেধ সকল সমাজের বিবাহ-বিধিতেই কোনও-না-কোনও রকমে আছে। হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়মে পিতার বংশে সাত ও মাতার বংশে পাঁচ সিঁড়ি উপরে ও নীচে এই নিষিদ্ধ সীমার গণ্ডি—'পঞ্চমাৎ সপ্তমাদুর্ধ্ব মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।' (যাজ্ঞবল্ক্য)। রাও কমিটির শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহে এই নিয়মই বহাল রাখা হয়েছে। অনেকে সম্ভব জানেন যে, এ-বিষয়ে সকল শাস্ত্রকার একমত ছিলেন না। কোনও কোনও শাস্ত্রকার এই গণ্ডিকে সংক্ষেপ করে পিতৃপক্ষ পাঁচ ও মাতৃপক্ষ তিন পর্যন্ত মাত্র গণনার বিধি দিতেন—'শ্রীনতীত্য মাতৃতঃ পঞ্চাতীত্য চ পিতৃতঃ' (পৈঠনসি)। গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর হিন্দু আইন পুস্তকে বলেছেন যে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে পৈঠনসির পাঁচ। আর তিন মতবাদই কার্যত চলে, যদিও বাঙালি স্মার্ত রঘুনন্দন সাত আর পাঁচ গণনার জোর পক্ষপাতী। শাস্ত্রী গোলাপচন্দ্রের কথা হয়তো একটু অতিরঞ্জিত, কিন্তু বাংলাদেশের অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণদের মধ্যেও পৈঠনসির মত কার্যত চলে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমার নিজের মতে এই প্রস্তাবিত আইনে সপিণ্ডত্বের সীমা পাঁচ। আর তিন-এ নির্দেশ করা উচিত। এই নিয়মের পক্ষে শাস্ত্রও আছে এবং বর্তমান হিন্দুর সামাজিক বোধ ও রুচিরও তা বিরুদ্ধ নয়। এই নিয়মে বিবাহ্য বর ও বিবাহ্যা কন্যার ক্ষেত্র বড় হবে, যার সামাজিক প্রয়োজন আছে।

রাও বিলের প্রস্তাবিত একপত্নীক বিবাহের বিরুদ্ধ মত এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কারণ, আইনে যাই হোক, সমাজে আধুনিক হিন্দু বিবাহ মোটের উপর একপত্নীক অর্থাৎ আমাদের, প্রায় সকলের মনের সম্মতি এক পত্নীকে বিবাহের আদর্শের দিকেই বহু

বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ করলে অন্য দেশে ও সমাজে মাঝে মাঝে যেসব অসুবিধা ঘটে তা আমাদের মধ্যেও ঘটবে। কিন্তু তার কুফলের পরিমাণ বহু বিবাহের কুফলের তুলনায় অনেক কম। মানুষের কোনও নিয়ম সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করা যায় না। যেটা মোটের উপর ভাল তাকেই বেছে নিতে হয়।

রাও বিলে বিবাহ ভঙ্গের যে সব বিধিনিষেধ আছে, তার একটা প্রধান প্রয়োজন হয়েছে। এই একপত্নীক বিবাহের আইনত প্রবর্তনে!! পরের প্রবন্ধে রাও বিলের প্রস্তাবিত বিবাহ ভঙ্গবিধির আলোচনা করা যাবে।

৫

হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠানে বর বধূকে বলে 'যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম'—আমার এই যে হৃদয় তা তোমার হোক, তোমার যে হৃদয় তা আমার হোক। অর্থাৎ বিবাহের ফলে বর বধুর হৃদয়ের যোগ হোক অতি নিবিড়। মন্ত্রের আর যে শক্তিই থাকুক, নরনারীর দুই হৃদয়কে এক করার ক্ষমতা নেই। ও মন্ত্রের উদ্দেশ্য নব বিবাহিত দম্পতির সামনে দাম্পত্য জীবন ও প্রেমের একটি আদর্শ ধরা ও প্রার্থনা করা যে দম্পতির জীবনে এ আদর্শ সফল হোক। কিন্তু এ সফলতা কদাচিৎ ঘটে। বেশির ভাগ দম্পতির জীবনে নরনারী পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে প্রথমে আকৃষ্ট হয়। তারপর দৈনিক জীবনের সাহচর্যে, সন্তানের প্রতি স্নেহ, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাত একসঙ্গে সহ্য কুরে মাটের উপর সুখে দুঃখে গার্হস্থ

জীবন এক রকম কেটে যায়। স্বামী স্ত্রীর একাত্মতা দুর্লভ বলেই কাব্যে ও উপন্যাসে তার উজ্জ্বল চিত্রে মানুষ মুগ্ধ হয়; আর যদি বাস্তব জীবনে সে একাত্মতা কাচিৎ দেখা যায়, তবে মানুষ তাতে কাব্য পাঠের আনন্দ পায়। অর্থাৎ দুর্লভ বলে এই রকম একাত্মতাকে মানুষ অলৌকিক মনে করে। কিন্তু কখনও কখনও অদৃষ্টের নিষ্ঠুর অভিশাপে, কি স্বামী বা স্ত্রীর কৃতকর্মের ফলে সাধারণ রাগ-বিরাগের ও সুখ-দুঃখের গার্হস্থ্য জীবনও স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে যাপন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই ভয়ংকব অবস্থা থেকে স্বামী ও স্ত্রীকে মুক্তি দেবার জন্যই প্রায় সভ্য-সমাজে বিবাহের বন্ধন ছেদনের ব্যবস্থা করতে হয়।

বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য, কি তা ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন, সমাজ ও আইনের এই রকম ব্যবস্থা নরনারীকে অনেক দুঃখ-কষ্ট অত্যাচার সহ্য করেও পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার অনুকুল মনোভাব সৃষ্টি করে। এই মনোভাবের অভাবে শিথিল বিবাহ-বন্ধন সভ্য-সমাজে বহু বন্ধনকেই শিথিল করে দেয়। সেই জন্য অনেক সভ্য-সমাজেই বিবাহের বন্ধন ছেদনকে যথাসম্ভব কষ্টসাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু এরও একটি সীমা আছে। অবস্থা এমন হতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন তাদের নিজেদের পক্ষেও শুধু মহাক্লেশকর নয়, সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। তেমন জায়গায় বিবাহকে ভঙ্গ হতে দেওয়াই ব্যক্তিগত ও সমাজগত প্রয়োজন। প্রাচীন হিন্দু আইনে এই কারণে অনেক স্থলে স্বামীর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার এবং স্ত্রীর স্বামীকে পরিত্যাগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কোন অবস্থায় বিবাহকে ভঙ্গ হতে দেওয়া হবে এবং কখন হবে না। এই বিধিনিষেধ প্রণয়ন সব সময়েই কঠিন। কারণ ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজন এই দুই দিক বিবেচনা করে তবেই এর নিয়ম প্রণয়ন করা যায়। বিবাহবন্ধন যাতে স্বভাবতই অশিথিল

থাকে, কিন্তু স্বামী কি স্ত্রীর জীবন একান্ত দুর্বহনা হয়—এই দুই দিকে সমান দৃষ্টি রাখলে তবেই বিবাহভঙ্গের বিধি গ্রহণযোগ্য হয়। রাও কমিটির প্রস্তাবগুলি এতে কতদূর সফল হয়েছে, সেটাই বিচার্য বিষয়।

অন্য নানা দেশের বিবাহভঙ্গের আইন অনুসরণ করে রাও কমিটি বিবাহ ভঙ্গের বিধিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক —কতকগুলি অবস্থায় স্বামী কিংবা স্ত্রীর আবেদনে আদালত প্রচার করতে পারবেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈধ ও আইনসঙ্গত কোনও বিবাহ আদৌ হয় নাই। দুই—অন্য কতকগুলি অবস্থায় স্বামী কি স্ত্রীর আবেদনে আদালত বৈধ বিবাহকে আদেশের তারিখ থেকে ভঙ্গ হল বলে নির্ধারণ করতে পারবেন। আদৌ সিদ্ধ বিবাহ হয় নাই–এই প্রচারের মোটামুটি কারণগুলি এই –(১) যদি বিবাহের সময় ও আদালতে আবেদনের সময় স্বামী কি স্ত্রীর পুরুষত্ব কি স্ত্রীত্ব না থেকে থাকে; (২) যদি স্বামী-স্ত্রী এই রকম সম্পর্কিত হয় যাদের মধ্যে আইনত বিবাহ নিষিদ্ধ, (৩) যদি বিবাহের সময় স্বামী কি স্ত্রী উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি থাকে; (৪) যদি বিবাহের সময় স্বামী কি স্ত্রীর পূর্ব বিবাহের স্ত্রী কি স্বামী জীবিত থাকে এবং সেই পূর্ব বিবাহ বলবৎ থেকে থাকে; (৫) যদি স্বামী কি স্ত্রীর বিবাহে সম্মতি, অথবা যেখানে তাদের অভিভাবকদের সম্মতি বিবাহে প্রয়োজন, সেরূপ সম্মতি বলে কি ছলে বিবাহের অপর পক্ষ নিয়ে থাকে।

সিদ্ধ বিবাহ ভঙ্গের কারণগুলি মোটামুটি এই-(১) যদি স্বামী বা স্ত্রী বিকৃতমনা হয় বা চিকিৎসার অতীত এবং বিবাহভঙ্গের আবেদনের পূর্বে যদি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর এই রকম বিকৃতমনা থেকে থাকে; (২) যদি স্বামী কি স্ত্রী অচিকিৎস্য মহাকুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হয় যে

ব্যাধি আবেদনকারী কি আবেদনকারিণীর ছোয়াচ থেকে উৎপন্ন হয়নি; (৩) যদি স্বামী কি স্ত্রী বিনা কারণে স্ত্রী কি স্বামীকে সাত বৎসর পর্যন্ত ত্যাগ করে থেকে থাকে; (৪) যদি স্বামী কি স্ত্রী অন্য ধর্মাবলম্বনের ফলে আর হিন্দু না থেকে থাকে; (৫) যদি স্বামী কি স্ত্রী সাত বৎসর পর্যন্ত সংক্রামক যৌনব্যাধিগ্রস্ত থেকে থাকে যে ব্যাধি আবেদনকারী কি আবেদনকারিণীর ছোয়াচ থেকে উৎপন্ন নয় এবং (৬) যদি অন্য কোনও স্ত্রীলোক স্বামীর রক্ষিতা হয়ে থাকে অথবা বারবনিতার জীবনযাপন করে।

বিবাহকে অসিদ্ধ প্রচারের বিধি ও সিদ্ধ বিবাহভঙ্গের বিধি—এ দুই-ই কেবল সেই সব বিবাহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হবে যেসব বিবাহ হবে এই হিন্দু কোড বা সংহিতা আইন হয়ে পাশ হবার পর। তার পূর্বেকার কোনও বিবাহে এসব বিধি প্রযুক্ত হবে না।

লক্ষ করার বিষয়, প্রস্তাবিত আইনে স্বামী ও স্ত্রীকে বিবাহের অসিদ্ধি প্রচার ও বিবাহ ভঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইনে হিন্দু স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে ও দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে, তাতে কোনও কারণ দেখাবার প্রয়োজন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে স্বামীর স্ত্রী পরিত্যাগের যেসব কারণ বলা হয়েছিল, সেগুলি আইনের ব্যবস্থা নয়; নৈতিক উপদেশমাত্র-বর্তমান আইনের এই বিধান এবং পরাশর সংহিতায় যে সব কারণে স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করে অন্য স্বামী গ্রহণের ব্যবস্থা দেওয়া ছিল, তাও এখন আইনত বাতিল, এক বিধবার পুনর্বিবাহ ছাড়া যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় আইন করে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তির মর্যাদার দিক থেকে স্ত্রী-পুরুষের এই সাম্য অবশ্য গ্রহণীয় এবং সামাজিক দিক থেকে এতে অহিতের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা

নাই। রাও বিলে যে সকল কারণে বিবাহ অসিদ্ধ কি ভঙ্গ হতে পারে, সেগুলি এমন কারণ যা সত্ত্বেও স্বামী কি স্ত্রীকে অনিচ্ছায় দাম্পত্য-জীবনযাপন করতে বাধ্য.করা কেবল মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা নয়, সমাজের পক্ষেও অমঙ্গলকর। রাও বিলের বিধিনিষেধগুলি ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের হিত কোনওটাকে অগ্রাহ্য করে একদিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছে বলে মনে হয় না। পূর্বকালে হিন্দু সমাজে এমন দিন ছিল, যখন এর চেয়ে অনেক লঘু কারণে বিবাহ ভঙ্গের বিধি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখি–স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণতা বিবাহ ভঙ্গের একটা কারণ ছিল-‘পরস্পর দ্বেষান্মোক্ষঃ’ (কৌটিল্য)।

বিবাহকে অসিদ্ধ প্রচার করা কি বিবাহকে ভঙ্গ করা দুই-ই নির্ভর করে স্বামী কি স্ত্রীর আদালতে আবেদনের উপর। সে রকম আবেদন করা না-করা স্বামী কি স্ত্রীর ইচ্ছাধীন। খুব সম্ভব, বহুস্থলে বিবাহ ভঙ্গের কারণ উপস্থিত হলেও স্বামী বা স্ত্রী তার জন্য আবেদন করবে না। উন্মাদ স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে তার সেবায় স্বামী জীবন কাটিয়েছেন—এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই এবং উন্মাদ স্বামীমাত্রকেই তার স্ত্রী পরিত্যাগ করবে, এ রকম আশঙ্কাও অমূলক। তবে সব মানুষের-কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক-মন সমান নয়। সকলের কাছ থেকে অসাধারণ মহত্ত্ব কি প্রেম আশা করা যায় না এবং তার উপর ভিত্তি করে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা চলে না। ভাবী স্বামী অতি অল্পজীবী হবেন জেনেও সাবিত্রী সত্যবানকে স্বামিত্বে বরণ করেছিলেন; কিন্তু সকল স্ত্রীর সাবিত্রী হওয়া সম্ভব নয়। এটা একটা আদর্শ। অল্প লোকেই সে আদর্শের নাগাল পাবে। সাধারণ মানুষের সাধারণ চরিত্রের উপর ভিত্তি করেই সামাজিক বিধিনিষেধ গড়তে হয়। মহৎ জীবনের মহত্ত্বের

পথও খোলা থাকবে, সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার পথও খোলা থাকবে। রাও কমিটির প্রস্তাবগুলি এর অন্যথাচরণ করেনি। এক জায়গায় রাও কমিটির বিধিব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি আছে মনে হয়। রাও কমিটির প্রস্তাবিত কোনও কোনও কারণে স্বামী বিবাহভঙ্গ করলে পরিত্যক্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন-যেমন উন্মাদিনী স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ যদি ভঙ্গ হয়। তার কারণ আমাদের সমাজে ও পৃথিবীর অনেক সভ্য-সমাজেই স্ত্রী ও পুরুষের ধনতান্ত্রিক বৈষম্য।

যাঁরা ভয় করেন যে, বিবাহ অসিদ্ধি ও বিবাহভঙ্গের এই সব বিধি-বিধান হিন্দুর বিবাহবন্ধন ও সমাজকে শিথিল করবে তাঁরা হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু নারীকে অন্যান্য সমাজের পুরুষ ও নারীর চেয়ে মনে মনে নিশ্চয়ই হেয় জ্ঞান করেন। বিবাহ ভঙ্গের বিধি থাকলেও স্বামী ও স্ত্রী সুযোগ পেলেই বিবাহ ভঙ্গের চেষ্টা করবে-এ রকম ব্যাপার অন্য সমাজে ঘটে না। হিন্দু সমাজে কোন ঘটবে, তার কারণ নেই। যাঁরা কারণ আছে মনে করেন, তাদের অবচেতন মনে সম্ভবত এই ধারণা আছে যে, হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের বিবাহের যে বন্ধন, তা কেবল টিকে আছে, আইনে সেই বিবাহ অন্তত স্ত্রীলোকের পক্ষে অচ্ছেদ্য বলে।

৬

প্রচলিত হিন্দু আইনের আংশিক পরিবর্তন ও আইনসভার মারফত হিন্দু কোড বা সংহিতা বিধিবদ্ধ করে সকল হিন্দুর জন্য এক আইন প্রবর্তন—এই চেষ্টার বিপক্ষে দুইটি সাধারণ আপত্তির আলোচনা এই শেষ প্রবন্ধে করব।

প্রথম রকমের আপত্তি হচ্ছে যে, চলতি হিন্দু আইনের কিছুমাত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন

নাই। ও আইন যা আছে, বেশ আছে। মুনি ঋষিরা আইন করে গেছেন। তাঁরা ছিলেন অভ্রান্ত ত্রিকালজ্ঞ। তাদের ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথাই উঠতে পারে না। রাও বিলের প্রথম খসড়া যখন প্রকাশ হয়, তখন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় একজন আইনজীবী বাঙালি হিন্দু এই মত খুব জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন। এখনকার দিনে আইনসভা যে সব আইন করে তার প্রথমে প্রায়ই এই বাক্য থাকে : 'যেহেতু অমুক বিষয়ে আইন প্রবর্তন বা আইনের সংশোধন প্রয়োজন, অতএব ইত্যাদি।' রাও বিলেও এই মামুলি কথা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছেঃ

'Whereas it is expedient to amend and codify certain branches of the Hindu Law as now in force' ইত্যাদি 'যেহেতু প্রচলিত হিন্দু আইনের কতক অংশ সংশোধন ও সংহিতাকারে বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন, অতএব ইত্যাদি।' 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার লেখক বলেছিলেন যে, এখানে বিসমিল্লায় গলদ। চলতি হিন্দু আইনের কোনও অংশের কোনও রকম পরিবর্তনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সুতরাং রাও বিল আর অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন। এই মতবাদীদের সঙ্গে যুক্তি তর্ক খুব সম্ভব নিরর্থক।

মুনি ঋষিদের নামযুক্ত ধর্মশাস্ত্রের যে গ্রন্থ আমরা পাচ্ছি, যেমন মনু কি যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ কি বৃহস্পতি, তাঁরা কোন কালের লোক ছিলেন এবং তাঁদের নাম সংযুক্ত ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ কতটুকু; সব ঋষিরাই যখন অভ্রান্ত ও ত্রিকালজ্ঞ, তখন এক ঋষির সঙ্গে অন্য ঋষির মতের অমিল কেন, যাতে সংস্কৃত ভাষায় প্রবাদ হয়েছে যে, তিনি ঋষিই নন, যার একটা ভিন্ন মত নাই; ধর্ম-শাস্ত্রের যুগের পর নিবন্ধকারেরা শাস্ত্র বাক্যের ব্যাখ্যাকে উপায়স্বরূপ করে কী রকম যুগে যুগে প্রয়োজন অনুসারে হিন্দু ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং এখনও ইংরেজের আদালতে বিচারকেরা যাদের অনেকে হিন্দু নন, কেমন করে হিন্দু আইনের অল্পাধিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছেন—এসব বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বোধ হয় পণ্ডশ্রম। কারণ এসব যে তাঁরা জানেন না, তা মনে হয় না। এসব জেনে শুনেও তাঁরা চোখ মুদে ও কান বন্ধ করে আচলের যোগাসনে বসেছেন। তাদের অধৃষ্য মূর্তি দেখে সমাজের প্রয়োজন প্রভৃতি চপল ব্যাপারগুলি সভয়ে দূরে পলায়ন করবে। এই আপত্তির নাম দেওয়া যেতে পারে ‘কভি নেহি’ আপত্তি। এই আপত্তি সম্বন্ধে বাক্যব্যয় বৃথা। এ আপত্তিকারীদের দুর থেকেই নমস্কার জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় রকমের আপত্তির সুর অতটা চড়াগ্রামে চড়ান নয়। সে আপত্তি হচ্ছে:

এবং বর্তমানের আইনসভাগুলি তার উপযুক্ত স্থান নয়। এ আপত্তিকে বলা যায়। ‘আভি নেহি’ আপত্তি। হিন্দু মহাসভার গত বিলাসপুর অধিবেশনে রাও বিল সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, সে প্রস্তাব এই আপত্তির একটা ভাল উদাহরণ। হিন্দু মহাসভা এ প্রস্তাবে বলেছেন যে, চলতি হিন্দু আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন নাই, একথা তাঁরা বলেন

না। পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁরা স্বীকার করেন। তবে বর্তমান আইনসভাগুলি হিন্দু জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। যখন প্রকৃত ডেমোক্রেটিক উপায়ে নির্বাচিত হয়ে আইনসভাগুলি জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধি স্থানীয় হবে, তখন সে প্রতিনিধি সভা বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে হিন্দু আইনের পরিবর্তন সাধন করবেন। তার পূর্বে পরিবর্তন হতে দেওয়া উচিত নয়।

হিন্দু মহাসভা যখন বলেছেন তখন লোকে মেনে নিতে বাধ্য যে, এই প্রস্তাব হিন্দু মহাসভার সভ্যদের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করছে, ও প্রস্তাব অশুভস্য কালাহরণের ফিকির নয়, অথবা স্বীকার কি অস্বীকার এ দুয়ের দায় থেকে আপাতত মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় মাত্র নয়। কিন্তু মনের এ সন্দেহ দূর করা কঠিন। কারণ বলছি : মহাসভার এই অধিবেশনেই হিন্দুস্থানের ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র কী রকম হওয়া উচিত তার এক খসড়ার অনুমোদন করে প্রস্তাব গ্রহণ হয়েছে। হিন্দু মহাসভা অবশ্য মনে করেন যে ওই খসড়া অনুসারে বিলাতের পার্লামেন্ট এখনই আইন পাশ করবেন অথবা ইংরেজের সম্মতি নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের লোকেরা ওই খসড়া অনুযায়ী এখনই হিন্দুস্থানে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্তিত করবে। এ সত্ত্বেও এ প্রস্তাব গ্রহণ করে হিন্দু মহাসভা তাঁর কর্তব্য কার্যই করেছেন। কারণ ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রের আকার কি হবে সে সম্বন্ধে দেশবাসীর মনকে প্রস্তুত করা সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। প্রতিষ্ঠান তার নিজের কল্পনা দেশের লোকের সামনে উপস্থিত করবার অধিকারী যাতে সেই অনুসারে দেশের লোকের মত গঠিত হয়। চলতি হিন্দু আইনের যদি পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে থাকে। তবে সে কী রকম পরিবর্তন সে সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার কর্তব্য ছিল দেশের

লোককে উপদেশ করা এবং সেজন্য জনমত গঠন করা। হিন্দু মহাসভা বিলাসপুরের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাতে এ কর্তব্য করা হয় নাই। ভারতবর্ষের হিন্দুর অধিকাংশ যদি প্রচলিত হিন্দু আইনের কোনও পরিবর্তন চায়। তবে বর্তমান অবস্থাতেও সেই অনুসারে আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, হিন্দু মহাসভার খসড়া অনুসারে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতন্ত্র বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি।

হিন্দু মহাসভা যে বর্তমানের আইন সভাগুলিকে আন-ডিমোক্রেটিক ও নন-রিপ্রেজেন্টেটিভ বলেছেন সে কথা ঠিক। কিন্তু তার উপর একটু বেশি ঝোক দিয়েছেন। প্রথমত হিন্দু মহাসভা যাকে বলেছেন আইন সভাগুলির সম্পূর্ণ ডিমোক্রেটিক গঠন, তার অর্থ যাই হোক, সে রকম গঠন পেতে যে বহু সময় যাবে তাতে সন্দেহের অবসর নেই। দ্বিতীয়ত পরিবর্তিত হিন্দু আইন প্রণয়ন সোজাসুজি ডিমোক্রেসির কাজ নয়। কারণ জনসাধারণের তা সাধ্যাতীত। বিশেষ, ভারতবর্ষের হিন্দু জনসাধারণের এখনও শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর। এ হচ্ছে তাদের কাজ যাঁরা বুদ্ধি ও বিদ্যায় অগ্রণী এবং সমাজতত্ত্বে যাদের দৃষ্টি আছে। এ রকম লোকই পরিবর্তিত হিন্দু আইন কী রকম হবে তার বিচার করে হিন্দু জনসাধারণের মতকে গড়ে তুলতে পারে। কেবলমাত্র ডিমোক্রেসির বিদ্যাবুদ্ধিতে যে হিন্দু সভার ভরসা নেই। ওই প্রস্তাবেই তাঁরা তার প্রমাণ দিয়েছেন। তা নইলে সম্পূর্ণ ডিমোক্রেটিক আইন সভার সভ্যদেরও আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শের ব্যবস্থা করতেন না। হিন্দু কোড এখন পাশ হোক কি অনেকদিন পরে পাশ হোক যাঁরা মনে করেন যে, প্রচলিত হিন্দু আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন তাদের এখন থেকেই কী রকম পরিবর্তন প্রয়োজন তার আলোচনা করে জনমতকে শিক্ষিত করা ও পরিবর্তনের প্রতি

অনুকুল করা উচিত। নইলে এ সন্দেহ কিছুতেই মন থেকে দূর করা যায় না যে তাঁরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যে পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে একথা সাহস করে বলতে চান না, কী রকম পরিবর্তন প্রয়োজন সেকথা প্রকাশ করে তাঁরা যে প্রকৃতই পরিবর্তন চান তা বলারও তাদের সাহস নেই। এতে হিন্দু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না।

রাও বিলের কতকগুলি প্রধান ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার মত সংক্ষেপে বলেছি। যদি তাতে ও বিলের আলোচনার কোনও সাহায্য হয় তবে শ্রম সার্থক হবে। হিন্দু আইন সংস্কারের প্রস্তাবে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে যুক্তিতর্ক দিয়ে শুভবুদ্ধির বিচার। সভায় একত্র হয়ে না বা হ্যা প্রস্তাব গ্রহণের মূল্য বেশি নয়। ও রকম প্রস্তাব খুব সম্ভব মনের তম বা রজের প্রকাশ মাত্র। সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম, যে সত্য মনকে আলো করে বস্তুর স্বরূপকে প্রকাশ করে।

সমাজ ও বিবাহ

হিন্দুর প্রচলিত বিবাহ-রীতির আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্তিত রীতিকে বিধিবদ্ধ করার জন্য আইনের এক খসড়া তৈরি হয়ে জনসাধারণের অবগতি ও বিচারের জন্য প্রচার হয়েছে। ইংরেজি ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যে 'হিন্দু-আইন কমিটি' নিয়োগ করেন এ খসড়া সেই কমিটি প্রস্তুত করেছেন। এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত বেনেগাল নরসিংহ রাও, এবং সভ্য আছেন ওই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, বোম্বাই-এর শ্রীযুক্ত ঘরপুরী ও শ্রীযুক্ত যোশী।

এই খসড়া অনুসারে আইন পাশ হলে তা কার্যকরী হবে ইংরেজি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে, অর্থাৎ এখন থেকে তিন বছর পরে।* আগামী তিন বছরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থা-তার শাসনযন্ত্র ও আইন-প্রণয়নের বিধি ব্যবস্থা কেমন দাড়াবে তা অনিশ্চিত। কারণ তা প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করবে বর্তমান যুদ্ধের গতি ও পরিণতির উপর। কিন্তু এই অনিশ্চয়ের মধ্যেই এই প্রস্তাবিত আইনের আলোচনা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ভাবী রাষ্ট্রচেহারা যা-ই হোক এ মহাদেশের হিন্দু জনসাধারণকে তাদের বিবাহ-বিধির নানা পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতেই হবে। চলতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদল ঘটলে সে প্রয়োজন কমবে না, বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বছর তিনেক পূর্বে অলকা' পত্রিকায় 'বাঙ্গালী হিন্দু' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সে লেখা অনেক লোকে পড়েছেন এমন দুরাশা ও অহংকার মনে রাখি না। সুতরাং সংক্ষেপে বলছি, সে প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বর্তমান হিন্দু-সমাজে ঐক্যের, ও একতায় যে বল আনে সে বলাধানের প্রধান অন্তরায় জাতিভেদের গণ্ডিতে আমাদের শতধা বিভক্ত সমাজ। হিন্দুশাস্ত্র-বর্ণিত বর্ণভেদের সঙ্গে আধুনিক জাতিভেদের জটিলতা ও অন্ধ কঠোরতার মিল খুব কম, এবং এ জাতিভেদ মরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি ছাড়া বর্তমান পৃথিবীতে আর কারও কাম্য হতে পারে না। সে প্রবন্ধে আরও বলেছিলাম যে, এ জাতিভেদের ভিত্তি জাতির গণ্ডির বাইরে বিবাহের নিষিদ্ধতায়। এ নিষেধবিধিকে দূর না করলে হিন্দু-সমাজ কোনও দিনই দৃঢ়বদ্ধ এক সমাজ হয়ে গড়ে উঠবে না। এবং দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, এই নিষেধের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক যুক্তি নাম দিয়ে যা সব বলা হয় সেগুলি যা আছে—তার সমর্থনে মনগড়া কল্পনামাত্র, সত্যে তাদের কোনও ভিত্তি নেই। এই নিষেধকে বহাল রেখেও আমাদের জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে এড়িয়ে হিন্দু-সমাজে সংহতি আনার আর যে-সব চেষ্টা-যেমন অ-জলচল জাতির হাতে মাঝে মাঝে সভা করে জল খেয়ে তাদের কৃতার্থ করা, বছরে একবার তাদের সঙ্গে একপঙক্তিতে ভোজন করে তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-স্থাপন—সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম, নিজের মন ও পরের মনকে ফাকি দেওয়া। শুয়ে শুয়ে হাত পা ছুড়ে খুব এগিয়ে যাচ্ছি কল্পনা আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

প্রস্তাবিত আইনে জাতিভেদের এই নিষিদ্ধ গণ্ডি কতটা দূর হয়েছে এ প্রবন্ধের তাই প্রধান আলোচ্য। প্রসঙ্গত এ খসড়ার অন্য মূল বিষয়গুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

আইন করে জাতিভেদ দূর করা যাবে না জানা কথা। কিন্তু হিন্দু-সমাজের ভিতরে যদি এ গণ্ডিকে লঙ্ঘনের বেগ সঞ্চিত হয়ে থাকে। তবে আইন নানা বাধা দূর করে তার গতিৰ পথে সহায় হতে পারে।

২

এই খসড়ায় দুই রকমের বৈধ হিন্দু-বিবাহ স্বীকৃত হয়েছে –শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহ। শাস্ত্রীয় বিবাহে অসবর্ণ, সপিণ্ড, একগোত্র ও সমান প্রবর বীরকন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। হোমাগ্নি-সাক্ষাতে মন্ত্রোচ্চারণ ও সপ্তপদীগমন এ বিবাহ-সিদ্ধির প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। তবে কোনও দেশাচার বা জাতি ও উপজাতি প্রভৃতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ও আচার অনুযায়ী বিবাহও বৈধ শাস্ত্রীয় বিবাহ বলে গণ্য হবে। লৌকিক বিবাহে বর্ণ-পিণ্ড-গোত্র-প্রবারের বাধা নেই। বরবধু এই আইনের নির্দিষ্ট কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত না হলেই তাদের মধ্যে বৈধ বিবাহ সিদ্ধ হতে পারবে। এই আইন-নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলি হচ্ছে একের সঙ্গে অন্যের সন্তান সম্পর্ক, ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্ক, পিতৃব্য-ভ্রাতৃকন্যা কি মাতুল-ভগিনীকন্যা সম্পর্ক ও পিতৃস্বসা-ভ্রাতুষ্পপুত্র কি মাতৃস্বসা-ভগিনীপুত্র সম্পর্ক। প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের নিযুক্ত জনৈক কর্মচারী ও তিনজন সাক্ষীর সমক্ষে বরবধুর পরস্পরককে স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণের অঙ্গীকার এ বিবাহের প্রযোজনীয় অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক এ দু'রকম বিবাহেরই ব্যাবহারিক ফল সমান। উভয় প্রকারে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা এক হিন্দু-দায়াধিকার আইনে শাসিত হবে। লৌকিক বিবাহের ফলে কেউ তার পরিবার থেকে বিচুত হবে না বা দেবোত্তর প্রভৃতির সেবায়েতি বা অধ্যক্ষতা

থেকে ৰঞ্চিত হবে না। দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা লোপ হবে না, এবং লৌকিক বিবাহকারী পুত্রকে মৃত গণ্যে তার পিতার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা হবে না।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝবেন যে, এই নতুন আইনের হিন্দু-বিবাহবিধি বর্তমান কালে হিন্দুর বৈধ বিবাহের, অর্থাৎ হিন্দুর যে বিবাহ ইংরেজের আদালতে বৈধ বলে স্বীকৃত হয়, তারই ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণ। শাস্ত্রীয় বিবাহে প্রচলিত হিন্দু-বিবাহের সমস্ত বিধিনিষেধ বহাল আছে। কেবল বরকন্যার সপিণ্ডত্ব নির্ণয়ে পিতৃপক্ষে সাত ও মাতৃপক্ষে পাঁচ পুরুষ গণনার একটা নিয়ম বেঁধে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রচলিত গণনারীতির একটা সমন্বয় করা হয়েছে। এবং অসবর্ণ-বিবাহের নিষেধে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য, শূদ্র, —এই চার মূল বর্ণের গণ্ডি ভেঙে বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রতি বর্ণের মধ্যে যে সব জাতি ও উপজাতি আছে তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। এ রকম বিবাহের বৈধত্ব ইংরেজের আদালতে অনেক দিন থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। যদিও সকল স্থানে এ নিয়মের প্রয়োগ সহজ নয়, এবং অনেক স্থানে সন্দেহহীন প্রয়োগ অসম্ভব। কারণ বর্তমান হিন্দু-সমাজ বহু বিচিত্র জাতিতে বিভক্ত, তার অনেক জাতি কোন মূল বর্ণের অন্তর্গত তার নির্ণয় দুরূহ। এ সব জাতির উৎপত্তির শাস্ত্রীয় ইতিহাস হচ্ছে যে, এরা চারবর্ণের মিশ্র-বিবাহের ফলে উৎপন্ন সংকর জাতি, বা ওই সংকরজাতিগুলির মধ্যে মিশ্র-বিবাহের ফলে উৎপন্ন অতিসংকর বা প্রকীর্ণসংকর জাতি বা ওই প্রকীর্ণজাতিগুলির মধ্যে মিশ্র বিবাহের ফলে উৎপন্ন প্রকীর্ণসংকরজাতি। শাস্ত্রে সংকর ও প্রকীর্ণসংকরজাতির অনেকগুলির নাম আছে, কিন্তু যেমন মিতাক্ষরাকার বলেছেন সেগুলি দৃষ্টান্তমাত্র-প্রদর্শনার্থমুক্তং, কারণ 'সংকীর্ণ

সংকরজাতনামানন্তাদ্বক্তুমশক্যত্বাৎ’-সংকীর্ণসংকরজাতিগুলির সংখ্যা অনন্ত জন্য নিঃশেষে তাদের নাম বলা যায় না। এই সংকর ও সংকীর্ণসংকরজাতিগুলি কোনটি কোন বর্ণের অন্তর্গত তার নির্ণয়ের নিয়ম কি? যে জাতিগুলি অনুলোম, অর্থাৎ উচ্চ বর্ণ-জাতি পুরুষের সঙ্গে নিম্ন বর্ণ-জাতি স্ত্রীর বিবাহের ফল। —তাদের সম্বন্ধে একটা নিয়ম পাওয়া যায় যে, সন্তানের বর্ণ হবে মাতার বর্ণ। যেমন শঙ্খ বলেছেন, ‘ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপাদিতঃ ক্ষত্রিয় এবং ভবতি, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্য এবং ভবতি’ ইত্যাদি, যদিও শঙ্খবচনের যথার্থ অর্থ অর্থাৎ বিবক্ষা নিয়ে বিবাদ আছে। কিন্তু প্রতিলোম অর্থাৎ নিম্ন বর্ণ-জাতি পুরুষের সঙ্গে উচ্চ বর্ণ-জাতি স্ত্রীর বিবাহের ফলে যে সব সংকর জাতির উৎপত্তি তাঁরা কোন বর্ণের অন্তর্গত? অর্বাচীন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মৃতি যা এখন প্রচলিত, তাতে প্রতিলোম বিবাহ অতি নিন্দিত। শাস্ত্রমতে সূত-বৈদেহিক-চাণ্ডাল-মাগধ প্রভৃতি জাতি প্রতিলোম বিবাহে উৎপন্ন। শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও মোটের উপর বলা যায় যে, এরা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। কিন্তু সংকর জাতির বর্ণনির্ণয়ের জটিলতার এখানেই শেষ নয়। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বর্তমানে কোনও জাতির নাম যদি শাস্ত্রবর্ণিত কোনও সংকর জাতির নাম হয় তবে নামসাদৃশ্যে সে জাতিকে শাস্ত্রোক্ত সংকরজাতি বলে গণ্য করতে হবে, তা হলেও অনেক জাতি এখন রয়েছে যাদের নাম কোনও প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। এ সব জাতির বর্ণ নির্ণয় করতে হলে জানতে হবে তাদের উৎপত্তির ইতিহাস। বহুস্থলেই এ ইতিহাসের কোনও মালমশলা নেই। এ রকম জাতির উৎপত্তির ইতিহাস নামে যা চলে তার লক্ষ্য সত্য-নির্ণয় নয়, তার উদ্দেশ্য জাতির সিঁড়িতে নিজের জাতিকে দু-এক ধাপ টেনে তোলা, বা পাশের জাতিকে দু-এক ধাপ নীচে ঠেলা। বাংলাদেশ থেকে পরিচিত দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। বাংলার বৈদ্যারা অনেক দিন

থেকে দাবি করে আসছিলেন যে তাঁরা শাস্ত্রোক্ত ‘অম্বষ্ঠ’ জাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্য স্ত্রীর সন্তানেরা তাদের আদি পুরুষ। ‘বিপ্রান্মুধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম অম্বষ্ঠঃ’ (যাজ্ঞবল্ক্য)। সুতরাং শঙ্খস্মৃতির বচন অনুসারে তাঁরা বর্ণে বৈশ্য ও দ্বিজ। বাংলার হিন্দু-সমাজে এ দাবি মোটের উপর গ্রাহ্য হয়েছিল। সম্প্রতি অনেক বাঙালি বৈদ্য বলছেন যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বর্ণে ব্রাহ্মণ। বৈদ্যরা যে ‘অম্বষ্ঠ’ সুতরাং বর্ণে বৈশ্য, তার প্রধান প্রমাণ ছিল যে, অম্বষ্ঠের শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি হচ্ছে চিকিৎসা‘সূতানামশ্ব-সারথমম্বষ্ঠানাং-চিকিৎসনম (মনু); এবং ইংরেজের আগমনে বৃত্তিতন্ত্র ভঙ্গের পূর্বে বৈদ্যদের জাতিগত বৃত্তি ছিল চিকিৎসা ও মোটের উপর তাঁরা দ্বিজের আচার পালন করতেন। বৈদ্যরা ব্রাহ্মণ, এর সমর্থনে এ রকম প্রমাণের অভাব হওয়ার কথা নয়। সত্য যেখানে অজ্ঞাত, কল্পনা সেখানে অবারিত। বাংলার কায়স্থেরা নিজেদের শূদ্র বলেই স্বীকার করে আসছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের এক নজির আছে যে কায়স্থের ছেলের সঙ্গে তাতির মেয়ের বিবাহ সিদ্ধ, কারণ দুজনেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। সকলেই জানেন অনেক বাঙালি কায়স্থ দাবি করছেন যে প্রকৃতপক্ষে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়বর্ণ, এবং তাঁরা দ্বিজোচিত আচারও পালন করছেন। যে প্রমাণে বাংলার বৈদ্যারা নিজেদের বৈশ্য কি ব্রাহ্মণ বলেন বাঙালি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের পোষকে সে রকম প্রমাণ উপস্থিত করা কিছু কঠিন নয়। আদালতে এ রকম সব দাবি উপস্থিত হলে কোন প্রমাণে তার বিচার হবে? কোন শাস্ত্র, ইতিহাস কি প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে? অথবা অনতিকাল পূর্বের দেশাচারই হবে সবচেয়ে গ্রাহ্য প্রমাণ? সুতরাং প্রস্তাবিত আইনের অসবর্ণ-বিবাহের বিধি-নিষেধ শুনতে যত সরল, তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ তত সহজ নয়। অধিকন্তু এর মূলেই আছে বড় গলদ। সংকর জাতিগুলির উৎপত্তির যে শাস্ত্রেতিহাস, হিন্দুর অনেক জাতিকে তার কাঠামে কিছুতেই

ফেলা যায় না। কারণ স্বীকার না করে উপায় নেই যে অনেক জনসমষ্টি চারবর্ণের বাইরে থেকে এসে একটা জাতির নাম নিয়ে হিন্দুসমাজে মিশে গেছে। সে সব জাতির বর্ণনির্ণয়ে তাদের উৎপত্তির সত্য ইতিহাস অবান্তর। কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি করলেই তবে তাদের বর্ণ-নিরূপণ সম্ভব হয়।

৩

প্রস্তাবিত আইনের 'লৌকিক বিবাহ' ১৮৭২ সালের প্রসিদ্ধ তিন আইনের ১৯২৩ সালে যে সংস্কার হয়েছে তারই কিছু পরিবর্তিত রূপ। মূল তিন আইন অনুসারে যদি কোনও হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ করত। তবে তাকে স্বীকারোক্তি করতে হত যে ধর্মে সে হিন্দু নয়। কারণ ওই আইন অনুসারে বিবাহ কেবল তাদের মধ্যেই হতে পারত যাঁরা খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান, পারসি, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন কোনও ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে স্বীকার করে না। কিন্তু ইংরেজের আদালতে বিচার হল যে এ অস্বীকার কেবল বিবাহার্থ। সুতরাং তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহকারী হিন্দু ও তাদের সন্তানদের দায়াধিকারের আইন হিন্দু-আইন। ১৯২৩ সালের সংস্কারে ব্যবস্থা হল যে যাঁরা নিজেদের হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনধর্মাবলম্বী বলবেন তঁরাও তিন আইন অনুসারে বিবাহ করতে পারবেন। সুতরাং ওই আইন অনুসারে অসবর্ণ বিবাহেচ্ছুক হিন্দু ধর্মে হিন্দু পরিচয়েই সে বিবাহ করতে পারবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হল যে এ রকমে বিবাহিত হিন্দুর দায়াধিকার আইন হিন্দু-আইন থাকবে না, হবে 'ভারতবষীয় উত্তরাধিকার' আইনের দায়ভাগবিধি, অর্থাৎ খ্রিস্টানদের দায়াধিকার আইন। এ বিবাহের ফলে হিন্দু তার পরিবার থেকে বিচুত হবে, দেবোত্তরে

কোনও স্বত্ব থাকবে না, দত্তকগ্রহণ নিষিদ্ধ হবে, তাকে মৃত্যগণ্যে তার পিতা দত্তকগ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ হিন্দু স্বীকারে যখন এ রকম বিবাহ করেছ তখন হিন্দু-আইন আর তোমার প্রতি প্রযোজ্য নয়! হিন্দু-আইন বহাল রাখতে হলে বিবাহের সময় বলতে হবে যে তুমি হিন্দু নও। পূর্বেই বলেছি যে প্রস্তাবিত আইন ১৯২৩ সালের সংস্কারের এই আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত ব্যবস্থাগুলিকে রদ করেছে।

৪

তিন আইনের ১৯২৩ সালের এই অদ্ভুত সংস্কারগুলি অকারণ নয়। ওদের উদ্দেশ্য ছিল অসবর্ণ বিবাহের নামে 'হিন্দুধর্ম গেল' বলে যাঁরা সরব হন তাঁদের আশ্বস্ত করা। করুক না লোকে হিন্দু নাম নিয়েই এ রকম বিবাহ। বিবাহের পর তাঁরা তো আর কোনও অর্থেই হিন্দু থাকছে না। বুরং ইংরেজ আদালতের বিচার উলটে বলা যায় যে, এদের হিন্দুত্ব স্বীকার কেবল বিবাহার্থ। আর বর্জন করে আত্মরক্ষার রীতিতে হিন্দু-সমাজ বহুদিন যে মরণান্ত বীর্য দেখিয়ে আসছে। এ বিবাহ স্বীকার হবে তার-ই একটা প্রকাশ। প্রস্তাবিত আইনে যে দুরকম হিন্দুবিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে তারও উদ্দেশ্য এই সনাতনীদের আশ্বস্ত করা। শাস্ত্রীয় বিবাহে যখন চলতি নিষেধ সব বহাল থাকল। তখন একটা অশাস্ত্রীয় 'লৌকিক বিবাহ' স্বীকারে ক্ষতি কী! কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। যদি সনাতনীদের তুষ্ট করে এ আইন পাশ করাতে হয় তবে এ আইন পাশ হবে না। কারণ দুরকম বিবাহের ব্যাবহারিক ফল যেখানে এক, অশাস্ত্রীয় লৌকিক বিবাহের পতি-পত্নীর হিন্দুর সমাজ ও ধর্মে সকল দাবি যখন সম্পূর্ণ বহাল থাকবে তখন সনাতনপন্থী তুষ্ট বা

আশ্বস্ত হবে কীসে? এ দ্বৈত যে মায়ামাত্র তা বুঝতে বেশি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দরকার হয় না। আর যদি সনাতনীদের বিরোধ সত্ত্বেও এ আইন পাশ হয় তা হবে তাদের মতের জোরে যাঁরা সমগ্র হিন্দু-সমাজের যুগ-উপযোগী পরিবর্তন চায়, সে সমাজের বিধি-বন্ধন থেকে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তিমাত্র চায় না। এ রকম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যথেষ্ট। কিন্তু সমস্ত সমাজের উপর তার ফল গৌণ ফল। হিন্দুর বর্তমান সমাজ এই গৌণ উপায়ে পরিবর্তনের চেষ্টায় যুগ ছাড়িয়ে এসেছে। এখন প্রয়োজন সমস্ত সমাজের হিতে হিন্দুর সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবর্তন, যার ফলে হিন্দু-সমাজ পাবে নুতন দৃঢ় গড়ন ও সে সমাজে আসবে নুতন প্রাণ ও নুতন বল।

প্রস্তাবিত আইনে অপরিবর্তিত শাস্ত্রীয় বিবাহ' বিধির পাশে পরিবর্তিত এক 'লৌকিক বিবাহ-রীতি দাঁড় করানোর ব্যবস্থা এই কাম্য পরিবর্তনের অনুকুল নয়। এ ব্যবস্থার বাহ্য আকার হচ্ছে সেই সব পূর্ব চেষ্টার অনুরূপ যা হিন্দু-সমাজের চলতি বিধিকে বহাল রেখে তার বন্ধন থেকে মুক্তিকামী লোকদের ছাড়পত্র দিতে চেয়েছে, যদিও এর আন্তরিক উদ্দেশ্য গৌণভাবে সে বিধির বদল ঘটানো। কিন্তু এ আইন পাশ হলেও এই বাহ্যিক আকারেরই জয় হবে, এর আন্তরিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এর ফলে হিন্দু-সমাজের বিবাহ-রীতির কোনও বড় পরিবর্তন ঘটবে না, যেমন ঘটেনি মূল তিন আইনে বা তার পরিবর্তিত রূপে। তার কারণ কিছু নিগূঢ় নয়। যে হিন্দু তার বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার পরিরর্তন চায় এ পরিবর্তন আসবে যতটা সম্ভব হিন্দুর আচার ঐতিহ্যকে বজায় রেখে। পরিবর্তনের ফল হবে পরিবর্তিত হিন্দু-সমাজ, পূর্বের সঙ্গে যোগসূত্রহীন সম্পূর্ণ নূতন বস্তু নয়। এই মনোভাবের কাছে পাণিগ্রহণ-মন্ত্র-উচ্চারণে বিবাহ আর রাজকর্মচারীর কাছে

রেজিষ্টি করে বিবাহ এক জিনিস নয়। হিন্দু-সমাজ থেকে অসবর্ণ বিবাহের বাধা দূর করার প্রকৃষ্ট উপায় নয় ও বিবাহকে ধর্মানুষ্ঠানে অপাঙক্তেয় করা, যাতে প্রচলিত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানেও বিবাহ সিদ্ধ হবে না, ওর সিদ্ধির জন্য দরকার হবে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর ও রেজিষ্ট্রি।

এ আইনের দু'রকম বিবাহ-বিধির প্রস্তাব আরও নিরর্থক, কারণ কি শাস্ত্রীয় কি লৌকিক উভয় বিবাহই করা হয়েছে একপত্নীক; এক স্ত্রী বর্তমানে স্বামীর পুনর্বিবাহ অসিদ্ধ হবে। আশা করা যায়। এ প্রস্তাবে সনাতনীদেরও খুব বেশি আপত্তি হবে না। আইনে যা-ই হোক, সমাজে আধুনিক হিন্দুর বিবাহ মোটের উপর একপত্নীক। অর্থাৎ আমাদের মনের সম্মতি একপত্নীক বিবাহের আদর্শের দিকেই। বহু-বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ করলে অন্য দেশে ও সমাজে মাঝে মাঝে যে সব অসুবিধা ঘটে তা আমাদের মধ্যেও ঘটবে। কিন্তু তার কুফলের পরিমাণ বহু-বিবাহের কুফলের তুলনায় অনেক কম। মানুষের কোনও নিয়ম সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করা যায় না। যেটা মোটের উপর ভাল তাকেই বেছে নিতে হয়।

৫

শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রভেদ যদি আইনে রাখতেও হয়, এবং শাস্ত্রীয় বিবাহে যদি অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধই থাকে। তবুও সে বিবাহে গোত্র-প্রবারের বাধা দূর করে বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রের আরও প্রসার করা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতামাতা মাত্রই জানেন হিন্দু-সমাজের সংকীর্ণ বিবাহক্ষেত্র কত বড় বিপত্তি। অথচ সগোত্র সমানপ্রবারের

বাধা আজ সম্পূর্ণ অর্থহীন। থিয়োরি হচ্ছে যে, জমদগ্নি প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ সকল ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। এই কয়জনের নামই গোত্রনাম। সুতরাং যে ব্রাহ্মণের বংশপরম্পরা যে গোত্র প্রসিদ্ধ ধরতে হবে তিনি সেই নামের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণের বংশধর। 'প্রবরে'র ব্যাপার আরও একটু ঘোরালো। প্রতি গোত্রে অনেকগুলি করে প্রবর আছে। সেগুলিও ব্যক্তিবিশেষের নাম। একটা প্রসিদ্ধি এই যে, 'প্রবর' প্রবর্তক ঋষিরা 'গোত্র' প্রবর্তক ঋষিদের পুত্রপৌত্র। সুতরাং সগোত্র ও সমান প্রবর লোকেরা যত দূরের সম্পর্কই হোক এক বংশের লোক। এবং যাদের প্রবর এক তাদের সম্পর্কটা ওরই মধ্যে একটু নিকট। কিন্তু মুশকিল। এই যে, ভিন্ন গোত্রেও এক প্রবারের নাম আছে। যেমন উপমনু গোত্রের এক প্রবর বিশিষ্ট, আবার পরাশর গোত্রেরও এক প্রবর বিশিষ্ট। অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রের লোক এক প্রবর হতে পারে। আমরা সবাই জানি সেই জন্যই সমানপ্রবারের বাধা বিবাহে সগোত্রের অতিরিক্ত আর এক বাধা। সুতরাং মেধাতিথি মনুভাষ্যে প্রশ্ন তুলেছেন যে, প্রস্তাবিত বরকন্যা যদি ভিন্নগোত্রের হয় তবে কি করে তাঁরা এক ঋষির সন্তান গণ্যে সমানপ্রবর হতে পারে। এবং মীমাংসা করেছেন যে, স্মৃতি যখন বলছেন হতে পারে তখন তাই স্বীকার করতে হবে। কারণ গোত্রপ্রবর জিনিসটি সম্পূর্ণ শ্রুতি-স্মৃতির এলাকার অর্থাৎ অলৌকিক বস্তু। লৌকিক যুক্তিতে ওর ব্যাখ্যা করা যাবে না। প্রকৃত কথা এই যে, ভাষ্যকার ও নিবন্ধকারদের সময়ে প্রবারের যথার্থ অর্থের স্মৃতিও লোপ হয়েছিল। এবং নানা পরস্পরবিরোধী কল্পনা তার স্থান পূরণ করছিল। পাঠক যদি রঘুনন্দনের উদ্ধাহতত্ত্বে ধৃত মাধবাচার্যের প্রবারের ব্যাখ্যার সঙ্গে, অসপিণ্ডী চ যা মাতুরসগোত্র চা পিতুঃ'-এই মনু বচনের মেধাতিথির ভাষ্য মিলিয়ে দেখেন তবেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে। গোত্র-প্রবারের যথার্থ ব্যাখ্যা যাই হোক সকলেই একমত যে, এক ব্রাহ্মণ

ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের বংশগত গোত্র-প্রবার সম্ভব নয়, কারণ গোত্র-প্রবর প্রবর্তক ঋষিরা ছিলেন সবাই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যে গোত্র-প্রবর সে হচ্ছে তাদের পুরোহিতদের গোত্র-প্রবর তাদের আরোপ করে। 'যদ্যপি রাজন্য বিশাং প্রতিস্বিক গোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাবঃ তথাহিপি পুরোহিতগোত্রাপ্রবরৌ বেদিবৌ' (মিতাক্ষরা)। কিন্তু এই আরোপিত গোত্র-প্রবরই আবার বিবাহে বাধা! শূদ্রের বিবাহার্থ কোনও গোত্র-প্রবর নেই। 'প্রাগুরু মনুশাতাতপবচনে দ্বিজাতিগ্রহণং সৈগোত্রবর্জনে শূদ্রব্যাবৃতার্থম' (উদ্বাহতত্ত্ব)। কিন্তু মজা এই যে, যাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের শূদ্র বলতেন এবং যাঁরা এখন নিজেদের দ্বিজ বলে তাঁরা কল্পিত গোত্র-প্রবারের বাস্তব বন্ধনে নিজেদের বাঁধতে বাধ্য হচ্ছেন!

কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষেও এই গোত্র-প্রবারের বাধার স্বরূপ কি? রক্তসম্বন্ধজন্য বিবাহ নিষেধের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ সপিণ্ড-সম্বন্ধ সীমার বাইরে হলেই তার সঙ্গে বিবাহ চলে এবং বাংলাদেশে সে সীমার মধ্যেও কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিত হলে তাকে বিবাহ করা যায়, কিন্তু যেখানে রক্তসম্বন্ধের কোনও ইতিহাস নেই, কেবলমাত্র বংশ-পরম্পরাগত দুইটি নামসাম্য বিবাহের অলঙ্ঘনীয় বাধা! যদি স্বীকার করা যায় যে একশো পুরুষ পূর্বে সগোত্র স্ত্রীপুরুষের পূর্বপুরুষ এক ছিল, কোন যুক্তিতে সেটা বিবাহে বাধা হতে পারে? সপিণ্ডের সঙ্গে বিবাহ নিষেধ। সপিণ্ড শব্দের অর্থ যাদের পিণ্ড বা দেহ এক, একন্দেহ থেকে যাঁরা উদ্ভূত। সিপিণ্ডতা তু এক শরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি' (মিতাক্ষরা)। কিন্তু এই অনাদি সংসারে সকলের মধ্যেই সকলের এ রকম সপিণ্ডতা সম্ভব, কিন্তু সেটা অতিপ্রসঙ্গ, কারণ তা হলে কোনও বিবাহই সম্ভব হয় না। 'তাচ্চ সর্বত্র

সর্বস্য যথাকথাং চিদামাদীে সংসারে ভবতীত্যাতিপ্রসংগঃ' (মিতাক্ষরা)। সুতরাং সপিণ্ড শব্দের অর্থকে নিতে হবে কাট-ছাট করে একটা নিয়মিত কার্যকরী গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে, পঙ্কজ শব্দের অর্থে যেমন করা হয়। অতশ্চায়ং সপিণ্ডশব্দোহবায়শাক্ত্যা সর্বত্র প্রবর্ত্তমানেহপি নির্মস্থা পঙ্কজাদি শব্দ বন্নিয়ত বিষয় এব' (মিতাক্ষরা)। সেই জন্যই বিবাহের সপিণ্ডতা মাতার বংশে পাঁচ পুরুষ ও পিতার বংশে সাত পুরুষেই শেষ হয়। 'পঞ্চমাৎ সপ্তমাৎ উর্ধাৎ মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা' (যাজ্ঞবল্ক্য)। হিন্দু-বিবাহে সগোত্রপ্রবারের নিষেধ বর্জনের চেয়ে হিন্দু-শাস্ত্রকারদের এ যুক্তির সুষ্ঠুতর প্রয়োগের ক্ষেত্র আর নেই।

৬

হিন্দু-বিবাহে সপিণ্ডের মধ্যে বিবাহ নিষেধের বিধি নিকট সম্পর্কিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহ নিবারণের নিয়ম। এ নিষেধ সকল সমাজের বিবাহরীতিতেই কোনও-না-কোনও রকম আছে। হিন্দু-সমাজের প্রচলিত নিয়মে পিতার বংশে সাত ও মাতার বংশে পাঁচ সিঁড়ি উপরে ও নীচে এই নিষিদ্ধ সীমার গণ্ডি। অনেকে সম্ভব জানেন যে, এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রকার একমত ছিলেন না। কোনও কোনও শাস্ত্রকার ওই গণ্ডিকে সংক্ষেপ করে পিতৃপক্ষে পাঁচ ও মাতৃপক্ষে তিন পর্যন্ত মাত্র গণনার বিধি দিতেন। 'শ্রীনতীত্য মাতৃতঃ পঞ্চাতেীত্য চ পিতৃতঃ' (পৈঠনসি)। পরবর্তী কালের ভাষ্য ও নিবন্ধকারেরা পৈঠনসি-প্রমুখদের মতো এই বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন যে, ও দুই সংখ্যার উল্লেখ তার চেয়ে কম সংখ্যার নিষেধের জন্য, সংখ্যা দুটিকে স্থাপনের জন্য নয়, কারণ তা না হলে স্মৃতিবাক্যের পরস্পর বিরোধ হয়। 'তদপ্যর্বাঙ নিষেধার্থং ন পুনস্তৎপ্রাপ্তার্থমিতি সর্বস্মৃতী

নামবিরোধঃ' (মিতাক্ষরা)। সকল স্মৃতিকার যে সমস্ত বিষয়ে একবিধি দিয়েছেন এটা স্পষ্টতই সত্য নয়, ভাষ্যকারীদের 'ওয়ার্কিং হাইপথেসিস' মাত্র–যার উপর নির্ভর করে নিজের মতের বিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্যকে যা কিছু একটা দুর্ব্যাখ্যা দিয়ে সরিয়ে রাখা যায়। সাত আর পাঁচ এই সহজ কথা বলা যার অভিপ্রায় সে কখনও ব্যাখ্যাকারদের উপর ভরসা রেখে বলতে যায় না পাঁচ। আর তিন। গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর 'হিন্দু আইন' পুস্তকে বলেছেন যে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে পৈঠনসির পাঁচ। আর তিন মতবাদই কার্যত চলে। যদিও বাঙালি স্মার্ত রঘুনন্দন সাত আর পাঁচ গণনার জোর পক্ষপাতী। আমার মতে প্রস্তাবিত আইনে সপিণ্ডত্বের সীমা পাচ আর তিন নির্দেশ করা উচিত। এ নিয়মের পক্ষে শাস্ত্রও আছে, এবং বর্তমান হিন্দু-সামাজিক বোধ ও রুচিরও তা বিরুদ্ধ নয়। এ নিয়মে বিবাহ্য বর ও বিবাহ্য কন্যার ক্ষেত্র বড় হবে, যার সামাজিক প্রয়োজন আছে।

এ আইনে শাস্ত্রীয় বিবাহের নিষিদ্ধ সম্বন্ধের গণ্ডি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খুব বড়, কিন্তু লৌকিক বিবাহের ওই গণ্ডি তিন আইনের নিষিদ্ধ গণ্ডির চেয়েও ছোট। প্রস্তাবিত আইনের এই নিষিদ্ধ সম্পর্কের বিবরণ পূর্বেই দিয়েছি। এ নিয়মে খুড়তুতো জোঠতুতো ভাই-বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কমিটি তাদের টীকায় বলেছেন যে, এ রকম বিবাহের বৈদিক প্রমাণ আছে, এবং এর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সত্য কথা। কিন্তু প্রাচীন প্রথার নজির তখনই কার্যকরী হয় যখন সে প্রথাকে পুনরায় চল করার সামাজিক প্রয়োজন আছে, এবং সামাজিক মন ও রুচি তার প্রতি একান্ত বিমুখ নয়। এ আইনের লৌকিক বিবাহের নিষিদ্ধ সম্পর্কের সীমা এত অপ্রসর যে এমন অনেক বর-কন্যার বিবাহ সম্ভব যে-বিবাহ আধুনিক হিন্দুর সামাজিক বোধ ও রুচিতে প্রকাণ্ড ঘা দেয়।

কমিটি বলেছেন যে তাদের প্রস্তাবিত এই নিষিদ্ধ সম্পর্কের তালিকা পৃথিবীর প্রায় অন্য সব দেশের নিষেধের তালিকার সঙ্গে এক। কথাটা সর্বাংশে সত্য বলে মনে হয় না। বহু সভ্যদেশের নিষিদ্ধ সম্বন্ধের সীমা এর চেয়ে বড়। নিকট সম্পর্কিতের মধ্যে বিবাহ নিষেধের জীব-বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আধুনিক বিজ্ঞানের মতে খুব দৃঢ় নয়। ওর যথার্থ ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক পরিবেশের ফলে সামাজিক রুচির বিরুদ্ধতা। সুতরাং কোনও বিশেষ সমাজের বিমুখ রুচিকে অন্য সমাজের দৃষ্টান্তে এখানে অগ্রাহ্য করা চলে না। আমার মতে শাস্ত্রীয় বিবাহের গণ্ডি কিছু খাটো করে, এবং লৌকিক বিবাহের গণ্ডি অনেকটা বাড়িয়ে বিবাহ-নিষেধের সম্বন্ধ-গণ্ডিকে এক করা উচিত। পৈতীনসির বিধি স্বীকার করলে আপাতত কাজ চলতে পারে। এবং তাতে দু'রকম বিবাহ-বিধি রাখার একটা কারণ লোপ হয়। এ পর্যন্ত হিন্দু-বিবাহ আইনের খসড়ার যে আলোচনা করেছি তাতে আমার মত সংক্ষেপে এই দাড়ায়।

১। 'শাস্ত্রীয়' ও 'লৌকিক' দু' রকম পৃথক বিবাহবিধি থাকবে না। হিন্দু বিবাহবিধি হবে এক রকম।

২। সে বিধিতে বর-কন্যার অসবর্ণত্ব বৈধ বিবাহের বাধা হবে না।

৩। সগোত্র বা সমানপ্রবর বর-কন্যার বিবাহ হতে পারবে।

৪। বিবাহের সপিণ্ডত্ব পৈঠীনসির মতানুযায়ী হবে পিতৃপক্ষে পাঁচ ও মাতৃপক্ষে তিন।

৫। বিবাহ হবে একপত্নীক।

কমিটি যেমন প্রস্তাব করেছেন তিন আইন অনুসারে কোনও হিন্দু, যিনি নিজেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে স্বীকার করেন, তার বিবাহ হবে না। ওই আইন বা অনুরূপ আইন থাকবে তাদেব জন্য যাঁরা 'ব্রাতা'–যাঁরা সংস্কার রহিত; যাঁরা কোনও ধর্মমতকে সামাজিক বিধির নিয়ামক স্বীকার করেন না। ভবিষ্যৎ কালের এক অখণ্ডজাতি ভারতবর্ষের তাঁরা সম্ভব পথপ্রদর্শক অগ্রদল। তাদের নমস্কার কবি। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজ নূতন কলেবর নিয়ে শক্তিমান হয়ে গড়ে উঠুক।

————